গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা ২০ - ২৬ মে, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

নেপালে ভারত সরকারের অস্ত্র সরবরাহের নিন্দায় কেন্দ্রীয় কমিটি

স্বৈরাচারী রাজার দমনমূলক শাসনের অধীন নেপালকে পুনরায় অস্ত্র সরবরাহ করার যে সিদ্ধান্ত সম্প্রতি ভারত সরকার গ্রহণ করেছে তার তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ১০ মে এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারের অবসান এবং পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে সেদেশের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে নেপালের জনগণ যখন মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত, সেই সময় এই সিদ্ধান্তের অর্থ — নেপালের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সরাসরি হস্তক্ষেপ করা।

ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্ত নেপালের সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর এক নির্মম আঘাত। অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে কমরেড মুখার্জী এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিবাদ ধ্বনিত করার জন্য এদেশের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন মানুষের কাছে আবেদন জানান।

ভ্যাট বিরোধী নাগরিক কনভেনশন ঃ মঞ্চে উপবিষ্ট (বাঁ দিক থেকে) সঞ্জিত বিশ্বাস, পার্থ সেনগুপ্ত, তারকনাথ ত্রিবেদী, তপন রায়চৌধুরী, অজয় সিংহরায়, মানিক মুখার্জী, ক্ষুদিরাম খাঁড়া ও বিভূতিভূষণ নন্দী। এছাড়া ছিলেন (ছবিতে অনুপস্থিত) চির দত্ত, সুজিত ভট্টশালী ও ডাঃ পি কে হাজরা।

‘ভ্যাট’ প্রত্যাহারের দাবি জানাল সংবাদপত্র সংস্থাগুলি

১ এপ্রিল থেকে যুক্তমূল্য কর ‘ভ্যাট’ চালু হওয়ার পর ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পণ্যের দাম খানিকটা বেড়ে গেছে। অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, ভ্যাটের ফলে জিনিসপত্রের দাম কমবে। কিন্তু তাঁর যাবতীয় আশ্বাসবাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করে নিউজপ্রিন্ট সহ সাধারণ লেখার কাগজের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। খাতা প্রস্তুতকারক ক্ষুদ্র সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই ‘ভ্যাট’ প্রত্যাহারের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে। এবার টনক নড়েছে নিউজপ্রিন্ট ব্যবহারকারী বৃহৎ সংবাদপত্র সংস্থাগুলিরও। গত ১০ মে ‘ইন্ডিয়ান নিউজপেপার সোসাইটি’র প্রতিনিধিরা নিউজপ্রিন্টের উপর থেকে ‘ভ্যাট’ প্রত্যাহারের অনুরোধ নিয়ে অর্থমন্ত্রীর দপ্তরে হাজির হয়েছিলেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্তান টাইমস্, দি হিন্দু, বর্তমান প্রভৃতি বড় মাপের সংবাদপত্র সংস্থার কর্মকর্তারা। (সূত্র ঃ টেলিগ্রাফ, ১১.৫.০৫)

ভারতে পেট্রো-করের হার অত্যন্ত চড়া

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষেই পেট্রোল-ডিজেল সহ সমস্ত পেট্রোপণ্যের উপর চাপানো করের হার সর্বাধিক। এদেশে পেট্রোলের উপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ধার্য করা মোট করের হার হল ৬২.৭ শতাংশ। অথচ থাইল্যান্ডে এই হার ২৭.১ শতাংশ; এমনকী পাকিস্তানে এই করের হার ৪৫ শতাংশ। আলাদাভাবে ডিজেলের ক্ষেত্রেও একই চিত্র। ভারতবর্ষে গণপরিবহন ব্যবস্থা মূলত ডিজেলের ওপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও এদেশের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলিতভাবে এর উপর কর ধার্য করেছে ৪৩.৯ শতাংশ হারে। শুধু ২০০৪-০৫ সালেই এদেশের সরকার পেট্রোট্যাক্স বাবদ আদায় করেছে ৯২ হাজার ১৬১ কোটি টাকা।

করের এই চড়া হারের কারণে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল ও ডিজেলের খুচরো দাম যথাক্রমে ৩৭.৮২ টাকা এবং ২৬.০০ টাকা প্রতি লিটার। রাজ্যগুলির করের কিছু তারতম্য থাকায় নানা রাজ্যে দামে কিছু কমবেশি আছে তবে তা সামান্য। অথচ, পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে দুটোরই দাম লিটার প্রতি ২৭.৮০ টাকা এবং থাইল্যান্ডের মতো দেশে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যায় ২৩.১০ টাকায়।

এমনিতেই বেসরকারি পরিবহণ সংস্থার মালিকরা মুনাফার থলি ভরিয়ে তুলতে সরকারের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে নিজেদের ইচ্ছামতো চড়া হারে গাড়ি ভাড়া বাড়িয়ে চলেছে। এরই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভাড়া বাড়ছে সরকারি পরিবহনের। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিপুল পরিমাণে কর গণপরিবহণের ভাড়া আরো বৃদ্ধির দিকে ঠেলে দেবে। নিজেদের ‘সাধারণ মানুষের সরকার’ বলে ঢাক পেটাতে পেটাতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি এভাবেই একচেটিয়া মালিকদের কর ছাড় দিয়ে জনগণের পকেট কেটে রাজস্ব আদায় করছে।

কলকাতা পুরসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে

আগামী পুরসভা নির্বাচনে পুরবোর্ড দখলের তিন অন্যতম দাবিদার — তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশের সাথে কংগ্রেস ও অন্যান্য সমমনোভাবাপন্ন দলের সমন্বয়ে গঠিত সংযুক্ত গণতান্ত্রিক জোট (ইউ ডি এ), তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট — প্রত্যেকেই কে কতটা কলকাতার উন্নয়নে কাজ করেছে তার ফিরিস্তি দেওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদের অভিযোগ তুলে চলেছে।

এগুলির সত্যমিথ্যা বিচারের আগে, যেটা সকলেরই ভাবা দরকার তা হল দুর্নীতিগ্রস্ত এবং রাজনৈতিক সুবিধাবাদে আকণ্ঠ নিমগ্ন কোন দলের পক্ষে সুষ্ঠু ও সৎভাবে পুরপরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। এই তিন পক্ষেরই ইতিহাস বিচার করলে দেখা যাবে, দুর্নীতির অভিযোগ সহ রাজনৈতিক সুবিধাবাদের প্রশ্নে এরা কেউই কারোর থেকে পিছিয়ে নেই। নির্বাচনের আগে জনসেবার ভূরি ভূরি প্রতিশ্রুতি এরা দেয় কিন্তু ভোটের পর সেগুলি রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ আন্তরিকতা দেখা যায় না। আবার দলত্যাগ করা, নির্বাচনী জোট ভাঙা ও গড়ার পিছনেও কোন নীতি বা জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধের বালাই এদের কারোরই নেই। এদের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি সম্পর্কে জনগণ দূরের কথা এরা নিজেরাই পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অহরহ এই অভিযোগ তুলছে। আশু স্বার্থসিদ্ধি এবং যেকোন উপায়ে ক্ষমতা দখল করাই এদের উদ্দেশ্য। এবং তার জন্য আজ যার বিরুদ্ধে বলছে কাল তার সঙ্গে নির্বাচনে জোট করতে এদের আটকাচ্ছে না বা যার বিরুদ্ধে বলছে একইসাথে তার সাথে জোটও করছে।

নীতিহীনতার ইতিবৃত্ত

সিপিএম কেন্দ্রে কংগ্রেসকে শুধু সমর্থন করছে নয়, কংগ্রেসের চূড়ান্ত জনবিরোধী সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করতে লোকসভায় তারা কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিচ্ছে এবং কোন কারণেই সংখ্যালঘু ইউ পি এ সরকারকে তারা ফেলে দেবে না তারও প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে। অথচ আশু পুরনির্বাচন এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে, রাজ্যের কংগ্রেসবিরোধী বামপন্থী মানুষকে ঠকাতে সিপিএম এখন মুখে ইউ পি এ সরকার সম্পর্কে লোকদেখানো সমালোচনা অনেক বেশি করছে এবং কংগ্রেসের নানা পদক্ষেপ সম্পর্কে ‘‘বামেদের আপত্তি আছে’’ বলে জোর প্রচারও করছে। এইভাবে তারা — জলে নেমেও বেশী না ভেজানো গোছের চূড়ান্ত সুবিধাবাদী নীতি নিয়ে চলছে। পুরনির্বাচনের আগে, কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ষপূর্তি উৎসবে সিপিএম নেতারা যে যাবেন না বলে বামপন্থার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছেন তার পিছনে প্রকৃত বামপন্থী মনোভাব বিন্দুমাত্র নেই। এ হল তাঁদের সুবিধাবাদী দুমুখো আচরণের জ্বলন্ত নজির।

অন্যদিকে সুব্রত মুখার্জী এখন কংগ্রেসকে নিয়ে সিপিএম বিরোধী মহাজোট গড়ে তুলেছেন। ভাবখানা যেন সিপিএমের তিনি কট্টর বিরোধী। অথচ ওয়াকিবহাল মহল খুব ভালোই জানেন সুব্রতবাবুর সঙ্গে সিপিএমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। এই ঘনিষ্ঠতার জন্যই গত পাঁচ বছর তিনি কলকাতার মেয়র থাকাকালে সিপিএম তাঁকে বিন্দুমাত্র বিব্রত করেনি। অপছন্দের লোক ঘটনাচক্রে ক্ষমতায় এসে গেলে সিপিএম তাঁর কী চূড়ান্ত হেনস্থা করে থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ সন্তোষ ভট্টাচার্যের আমলে সিপিএমের আচরণ তার দৃষ্টান্ত। অথচ সুব্রতবাবু মেয়র থাকাকালে সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকার পুরসভাকে অকাতরে টাকা দিয়েছে যার অনেকটাই বিদেশি ঋণের টাকা। রাজ্যের সিপিএম পুরমন্ত্রীর সঙ্গে মেয়রের বড় রকম বিরোধও কখনো হয়নি। সুব্রতবাবুর বিরুদ্ধে তাঁর নিজের দলেরই মেয়র পারিষদ দুর্নীতির অভিযোগ আনলেও রাজ্য সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করেনি। পুরসভায় কোন অচলাবস্থাও সিপিএম সৃষ্টি করেনি, যা তারা তাদের বিরোধীদের বিরুদ্ধে সর্বত্র করে থাকে। আবার সুব্রত মুখার্জী সিপিএমের বিরুদ্ধে মহাজোটের ডাক দিয়েছেন যে কংগ্রেসকে সাথে নিয়ে, সেই কংগ্রেস এখন প্রকাশ্যেই সিপিএমের বন্ধু। এ থেকেই বোঝা যায় এই মহাজোটের লক্ষ্য সিপিএমের অপশাসন দূর করা নয়, এর লক্ষ্য হল সিপিএম বিরোধী ভোট এককাট্টা করে যেনতেনপ্রকারেণ পুরবোর্ড দখল করা।

আবার তৃণমূল বলছে তারা কোনমতেই কংগ্রেসের সঙ্গে যেতে পারে না, কারণ কেন্দ্রে কংগ্রেস সিপিএমের সাথে হাত মিলিয়ে সরকার চালাচ্ছে, যে সিপিএম পশ্চিমবাংলায় নিজেরাই চরম দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। ফলে সিপিএম-কে ক্ষমতা থেকে হঠানোই তৃণমূলের রাজনীতির একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকলেই জানেন, ’৭২ সালে এ রাজ্যে খোলাখুলি সন্ত্রাস চালিয়ে ও ব্যাপক রিগিং করে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। জরুরি অবস্থায় কংগ্রেস

সাতের পাতায় দেখুন

জেলায় জেলায় বিদ্যুৎগ্রাহকদের আইন অমান্য ও বিক্ষোভ। লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার

হুগলি

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, ক্ষুদ্রশিল্পে ফিক্সড চার্জ চালু এবং বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল প্রভৃতি দাবিতে গত ১০ মে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা'র) ডাকে জেলায় জেলায় আইন অমান্যের কর্মসূচি নেওয়া হয়।

ঐদিন প্রবল দাবদাহ উপেক্ষা করে ২ শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক জমায়েত হন চুঁচুড়া খাদিনা মোড়ে। এখানে এক সংক্ষিপ্ত সভায় অ্যাবেকার জেলা সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী, জেলা সহসভাপতি মহাদেব কোলে এবং জেলা কমিটির বিশিষ্ট সদস্য সীতাংশু তপাদার বক্তব্য রাখেন। এরপর এক সুশৃঙ্খল মিছিল ১৪৪ ধারা অমান্য করে জেলাশাসক দপ্তরে পৌঁছায় এবং সেখানে অবস্থান চলতে থাকে। জেলা শাসকের অনুপস্থিতিতে অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রতিনিধিদের আলোচনায় বসার জন্য অনুরোধ জানান। ৫ জনের এক প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে গ্রাহকদের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন। দাবিগুলির মীমাংসা না হলে আগামী জুলাই মাস থেকে বিল বয়কট এবং প্রতিরোধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য নেতৃবৃন্দ জনতার কাছে আহ্বান জানান।

বাঁকুড়া

কৃষি সহ সর্বস্তরে বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি ও তথাকথিত পারস্পরিক ভর্তুকি বিলোপের প্রতিবাদে বাঁকুড়া জেলাশাসক দপ্তরে অ্যাবেকা'র ডাকে বিদ্যুৎগ্রাহকরা আইন অমান্য করেন ১০ মে। প্রচণ্ড দাবদাহ, বন্য হাতীর তাণ্ডব এবং পর্ষদের নানাবিধ অত্যাচারকে উপেক্ষা করে জেলার শত শত বিদ্যুৎগ্রাহক এতে অংশ নেন। জেলাশাসকের দপ্তরে মিছিল এসে পৌঁছালে পুলিশ বিনা প্ররোচনায় গ্রাহকদের উপর লাঠিচার্জ করে ; ফেস্টুন, ব্যানার, পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে। ১০ জন গ্রাহক আহত হন। এতদ্‌সত্ত্বেও বিদ্যুৎগ্রাহকরা দীর্ঘক্ষণ ধরে সাহসের সাথে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালান এবং সকলেই গ্রেপ্তার বরণ করেন। পুলিশি লাঠিচার্জকে নিন্দা করে অন্যায় মাশুলবৃদ্ধি, ব্যাপক লোডশেডিং, লো-ভোল্টেজ এবং ভুতুড়ে বিলের আক্রমণের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক স্বপন নাগ, সভাপতি বলরাম পাল, সহ সম্পাদক জয়দেব কর, অ্যাডভোকেট হরিদাস ব্যানার্জী ও সুজিত রায়।

উত্তর ২৪ পরগণা

সাম্প্রতিক বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি, বিশেষ করে কৃষি-বিদ্যুতের ৭০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গত ১০ মে অ্যাবেকার উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির নেতৃত্বে ব্যারাকপুরে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সার্কেল ম্যানেজারের অফিসে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। ঐদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় তিনশত বিদ্যুৎগ্রাহক ১৬ দফা দাবির ভিত্তিতে সার্কেল অফিস ঘেরাও করে রাখেন। কৃষি-বিদ্যুতে অবিলম্বে মিটার দেওয়া, মিটার না দেওয়া পর্যন্ত মাশুল আদায় স্থগিত রাখা প্রভৃতি দাবির ভিত্তিতে ঘেরাও চলে। দাবিগুলির সুষ্ঠু সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই মর্মে সার্কেল ম্যানেজার আশ্বাস দিলে ঘেরাও প্রত্যাহার করা হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমিটির সম্পাদক অনুকূল ভদ্র সহ অসিত মুখোপাধ্যায়, উৎপল সিন্‌হা এবং দুলাল চক্রবর্তী।

জলপাইগুড়ি

গত ১০ মে বিদ্যুৎ পর্ষদের জলপাইগুড়ির সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের কাছে অ্যাবেকার পক্ষ থেকে ৫ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করা হয়। শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক মিছিল করে শহর পরিক্রমার পর এস ই অফিসের সামনে বিক্ষোভ

শিলিগুড়িতে বিদ্যুৎগ্রাহকরা আইন অমান্য করতে যাচ্ছেন

প্রদর্শন করেন। বিদ্যুতের মাশুল হ্রাস, গরিব গ্রাহকদের সস্তায় বিদ্যুৎ ও ভর্তুকি চালু, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল এবং গ্রামীণ এলাকায় বৈদ্যুতিকরণের দাবিতে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জীবন সরকার, সমসের আলি, রবি রায়, দেবাশিস সাহা প্রমুখ।

বর্ধমান

৩ মে মেমারী ব্লকের সাতগাছিয়া গ্রুপ সাপ্লাই-এর অন্তর্গত রাধাকান্তপুর গ্রামের বিদ্যুৎগ্রাহকরা দীর্ঘ ৮ বছর যাবত লো-ভোল্টেজের সমস্যার সমাধানের দাবিতে বিক্ষোভে সামিল হন। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কৃষিতে প্রায় ৭০ শতাংশ মাশুলবৃদ্ধি করায় একদিকে বোরো চাষীদের চাষ বন্ধ হতে চলেছে, অন্যদিকে খেতমজুররা কাজ হারাতে বসেছে। প্রান্তিক চাষীরা রীতি মেনে দরখাস্ত করলেও ঘুষ না দিলে সেচে বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছে না। জাতীয় বিদ্যুৎ নীতি অনুযায়ী ৩০ ইউনিট পর্যন্ত ৫০ শতাংশ মূল্য ছাড়ের নির্দেশ বর্ধমান জেলাতে কার্যকরী করা হচ্ছে না। খারাপ মিটার পরিবর্তন না করে ভাড়া নেওয়া হচ্ছে। এক মাসের মধ্যে নতুন কানেকশান দেওয়া, অবৈধভাবে লাইন কাটার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুনঃসংযোগ ঘটানো সবগুলিই অবহেলিত হচ্ছে। এছাড়াও লো-ভোল্টেজ ও লোডশেডিং-এর সমস্যা এই গরমের দিনে জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাসের নেতৃত্বে কয়েকশ' বিদ্যুৎ গ্রাহক বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন।

মুর্শিদাবাদ

বহরমপুরে দুই শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদে আইন অমান্য করেন। পুলিশের লাঠিচার্জে ৫ জন আহত হন। নেতৃত্ব দেন কুনাল বিশ্বাস ও মানোয়ার হোসেন।

দার্জিলিং

শিলিগুড়িতে মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের বিদ্যুৎগ্রাহকরা সমবেত হয়ে মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানিয়ে আইন অমান্য করেন।

নদীয়া

কৃষ্ণনগরে জেলাশাসকের অফিসের সামনে গ্রাহকরা আইন অমান্য করতে অগ্রসর হয়ে প্রতিরোধ ভেঙে জেলাশাসকের দপ্তরে ঢুকে গিয়ে বিক্ষোভ জানাতে শুরু করেন। পরে পুলিশ গ্রাহকদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

জেলার বিভিন্ন এলাকার দুই শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক বারুইপুর মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে সমবেত হয়ে আইন অমান্য করেন।

মালদহ

মালদহ জেলার বিদ্যুৎগ্রাহকরা অ্যাবেকা'র নেতৃত্বে সারা দিন অবস্থান বিক্ষোভের কর্মসূচি পালন করেন।

দক্ষিণ দিনাজপুর

বালুরঘাট ডি এম অফিসে জেলার বিভিন্ন এলাকার বিদ্যুৎগ্রাহকরা আইন অমান্য করেন।

পশ্চিম মেদিনীপুরে বিদ্যুৎগ্রাহকদের আইন অমান্য

কোচবিহার

জেলার প্রায় দুইশত বিদ্যুৎগ্রাহক ১০ মে পর্ষদের বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন।

পশ্চিম মেদিনীপুর

১২ মে মেদিনীপুর টাউনে তিন শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক আইন অমান্য করেন। পুলিশ লাঠি চালালে ৬ জন গ্রাহক আহত হন। ১৭ জন মহিলা সহ ২৯৩ জন গ্রেপ্তার বরণ করেন।

কলকাতা

সি ই এস সি'র সদর দপ্তর ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে ১০ মে দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিক্ষোভ অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়।

বিক্ষোভকারীদের সামনে অ্যাবেকা'র সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মাশুলবৃদ্ধির ফলে ইতিমধ্যে কৃষকরা আত্মহত্যা শুরু করেছে। সি ই এস সি'তে লাগাতার আন্দোলনের চাপে গড় মাশুল কমানো সম্ভব হলেও এর সুফল বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীকে পাইয়ে দিতে, তাদের ইউনিট প্রতি মাশুল কমিয়ে দিয়ে ক্ষুদ্র গ্রাহকদের ইউনিট প্রতি মাশুল বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বণ্টন ও সঞ্চালনে অতিরিক্ত ২ শতাংশ ক্ষতি গ্রাহ্য করে ১০০ কোটি টাকার মাশুলবৃদ্ধির বোঝা গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকী ফুয়েল চার্জ বাবদ অতিরিক্ত আদায় করা ৫৩ কোটি টাকা তারা এখনও ফেরত দেয়নি। তিনি বলেন, অবিলম্বে দাবিগুলি মানা না হলে জুন মাসে মহাকরণের সামনে বিক্ষোভ জানানো হবে। তিনি গ্রাহকদের লাগাতার বিল বয়কটের প্রস্তুতি গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ চির দত্ত, অধ্যাপক কান্তীশচন্দ্র মাইতি, আইনজীবী ভবেশ গাঙ্গুলী, সত্যেন ভট্টাচার্য, শিবাজী দে প্রমুখ।

নলহাটি থানায় যুব ও মহিলা বিক্ষোভ

নলহাটি থানা এলাকায় চোলাই মদ বিক্রি, নারী নির্যাতন, যত্রতত্র মদের লাইসেন্স দেওয়া, অসামাজিক কার্যকলাপ রোধ ও নলহাটি থানা পুলিশের সবরকম দুর্নীতির প্রতিবাদে নলহাটি থানায় গত ৯ মে যুব ও মহিলা বিক্ষোভ দেখানো হয়।

এই উপলক্ষ্যে নলহাটি রামমন্দির মাঠের সমাবেশে এস ইউ সি আই নলহাটি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড আব্দুস সালাম, উদ্ভূত সমস্যায় রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে তার প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

থানায় ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ডি ওয়াই ও'র মাসেদুল ইসলাম, খাসাধন মাল, মনিরুদ্দিন খান, কৃষ্ণ মাল এবং এম এস এস-এর অনিমা চক্রবর্তী, তহিনুর খান, রেবেকা সুলতানা ও চপলা মাল।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

এম এস এস-এর আন্দোলনের চাপে ধর্ষণকারীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ

ক্যানিং থানার নিকারিঘাটা অঞ্চলের দক্ষিণ অঙ্গদবেড়িয়া গ্রামের সুশান্ত মণ্ডলের স্ত্রী পুতুল মণ্ডলকে ১১ মার্চ রাতে ধর্ষণ করে প্রতিবেশী সিপিএম কর্মী তপন মণ্ডল। পুতুলের চিৎকারে পাশের বিয়েবাড়ির লোকেরা এসে তপনকে ধরে ফেলায় সে নিজের দুষ্কর্মের কথা সর্বসমক্ষে স্বীকার করে। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে ছুটে পালায়।

পরের দিন পুতুলের স্বামী অভিযোগ করলেও পুলিশ তপনকে গ্রেপ্তার করেনি পুতুলের ডাক্তারি পরীক্ষাও করায়নি। শুধু তাই নয়, এস ডি পি ও, ধর্ষিতার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন। স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব প্রথম থেকেই তপনকে আড়াল করার চেষ্টা করে। তাদের নির্দেশে পুলিশ ঘটনা চাপা দিতে চাইছে বুঝতে পেরে ১২ মার্চ সন্ধ্যাতেই এম এস এস-এর স্থানীয় কমিটির পক্ষ থেকে পুতুল ও তার স্বামীকে থানায় নিয়ে গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপর ২২ মার্চ এম এস এস-এর নেতৃত্বে শতাধিক মহিলা থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ও ডেপুটেশন দেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন এম এস এস-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড পুষ্প পাল। এলাকার সাধারণ মানুষও এই বিক্ষোভে যোগ দেয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড মাধবী প্রামাণিক এবং কমরেড সবেদা সেখ। লাগাতার আন্দোলনের চাপে অবশেষে পুলিশ তপন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছে এবং পুতুলের ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। আন্দোলনের এই জয়ে এলাকার মানুষ উৎসাহিত।

সরকারের মুখে সুন্দরবন বাঁচাও স্লোগান বাস্তবে ধ্বংসের কার্যক্রম

''সুনামি থেকে শিক্ষা নাও/আমাদের সুন্দরবন বাঁচাও'' — এই নতুন স্লোগানটি তুলেছে রাজ্য সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ। এই স্লোগানের ভিত্তিতেই গত ২৬ মার্চ দক্ষিণ ২৪ পরগণার বকখালিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জনসভা এবং পরদিন ২৭ মার্চ হয়েছে আলোচনাসভা। প্রচুর সংখ্যায় বাস ব্যবহার করা হয়েছিল বিনাভাড়ায় লোক জমায়েত করার জন্য। বলাবাহুল্য, সভার জাঁকজমক, লোক পরিবহণ সহ সভা সংক্রান্ত বিপুল খরচের সবটাই বহন করেছে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের থেকে আদায় করা ট্যাক্সের টাকা দিয়েই সভার সমস্ত খরচ মেটানো হয়েছে।

এই বিপুল অর্থব্যয়ে জনসভা করে সরকার যা বলতে চায়, সেটাই মুখ্যমন্ত্রীর জনসভার আগের দিন বিস্তৃত আকারে সিপিএমের দলীয় মুখপত্র গণশক্তিতে (২৫-৩-০৫) সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলীর একটি প্রবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্যগুলির পুনরাবৃত্তি করে সেই প্রবন্ধে বলা হয়েছে, 'সুনামির হাত থেকে বাঁচার মূল শিক্ষা — সমুদ্র উপকূল জুড়ে প্রাকৃতিক প্রাচীর গড়ে তোলা, অর্থাৎ সুন্দরবনের অমূল্য ম্যানগ্রোভ বনভূমিকে সযত্নে রক্ষা করা, আর গড়ে ওঠা নতুন চরভূমিতে ম্যানগ্রোভ বনভূমি সৃষ্টি করা। চিরহরিৎ লবণাম্বু উদ্ভিদের এই বনভূমি প্রতিহত করতে পারে সামুদ্রিক ঢেউয়ের প্রলয়ঙ্করী ক্ষমতাকে। তাই আর বনসংহার নয়, শুধু বনসৃজন।'

বকখালির জনসভা ও আলোচনা-সভা, তার প্রচার-প্রস্তুতি, মন্ত্রীদের বক্তৃতা ও প্রবন্ধ — সবকিছু মিলিয়ে সরকার সুন্দরবনবাসীকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছে যে, সুন্দরবনকে বাঁচাতে তাদের জান-কবুল এবং বনসংরক্ষণ ও বনসৃজনে তারা ভীষণ রকম তৎপর। সেই তৎপরতা না হয় বোঝা গেল; সরকার বনসংরক্ষণ ও বনসৃজনের ব্যবস্থা করুক, কেউই আপত্তি করবে না। কিন্তু কাজ শুরুর আগেই তা নিয়ে এত ঢাকঢোল পেটানো কেন? যে সরকার টাকা নেই বলে হাসপাতালে ওষুধ দিতে পারছেনা, শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে পারছে না বলে দু'বেলা অজুহাত দিচ্ছে, সেই সরকারই সুন্দরবন উন্নয়নের নামে কেবল ঢাকঢোল পেটাতেই কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে কোন্ যুক্তিতে? কী তার উদ্দেশ্য? প্রশ্নটা সেখানেই। সুন্দরবনের নানান দ্বীপের যাঁরা বাসিন্দা এবং যাঁরা নদী-সমুদ্রের মৎস্যজীবী — তাঁরা বলছেন, সরকার নিজেই পরিকল্পিতভাবে সুন্দরবন ধ্বংস করছে, সেজন্য মানুষ বিক্ষুব্ধ; সেই বিক্ষোভকে ধামাচাপা দিয়ে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেই এমন ঢাকঢোল পেটানোর মহা আয়োজন।

সুন্দরবন ধ্বংস করছে সরকার নিজেই

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার মোট ১৯টি ব্লকের ১১০টি দ্বীপ ও প্রায় ৫৬ লক্ষ মানুষ নিয়ে সুন্দরবন গঠিত। এর মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে মানুষের বসতি, বাকিগুলি বনজঙ্গল। প্রথমত, সরকার নিজেই সেই জঙ্গল-অধ্যুষিত দ্বীপগুলির বিরাট বিরাট অংশের অমূল্য ম্যানগ্রোভ অরণ্য কেটে সাফ করে ট্যুরিস্টদের জন্য বানিয়ে চলেছে সুবিশাল বাংলো, বিল্ডিং, টাওয়ার, কংক্রিটের জেটি ইত্যাদি। যেমন, কুলতলী থানার বেনিফেলি দ্বীপে সরকার পর্যটন শিল্পের দোহাই দিয়ে অরণ্য ধ্বংস করে বিরাট বিল্ডিং ও টাওয়ার বানিয়েছে এবং ২০০৩ সালে তার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী, বনমন্ত্রী যোগেশ বর্মন এবং পর্যটন মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়া। সন্দেশখালি থানার বুড়ির ডাবু এবং দোবাঁকি জঙ্গলে এক কিলোমিটার লম্বা ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস করে কংক্রিটের জেটি বানানো হয়েছে, তার দু'দিকে তারজালের বেড়া। গোসাবায় নেতিধোপানি জঙ্গলে গাছ কেটে সেখানে বিশাল টাওয়ার বসানো হয়েছে, হলদিবাড়ির জঙ্গলে বানানো হয়েছে বিশাল বাংলো। সম্প্রতি কলসদ্বীপে খোলা হয়েছে ইকো-ট্যুরিজম ক্যাম্প; সেখানে ট্যুরিস্টদের আরাম-আয়েসের জন্য অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত 'কুটির' বানানো হয়েছে; সেই সঙ্গে বিদেশি দুটি সুইস ক্যাম্প বসানো হয়েছে এবং সমস্ত এলাকার ম্যানগ্রোভ বন কেটে সাফ করে তারের জালের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। প্রশ্ন হল, এইসব আয়োজন কি সুন্দরবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য? এর নাম কি 'আর বনসংহার নয়, শুধু বনসৃজন'? মন্ত্রী লিখেছেন, 'সুন্দরবনের অমূল্য ম্যানগ্রোভ বনভূমিকে সযত্নে রক্ষা' করতে হবে; উপরের ঘটনাবলী কি তারই নমুনা?

নদী সমুদ্রের ভয়াবহ দূষণ সরকার হতে দিচ্ছে

বিভিন্ন শহরাঞ্চলের কারখানা সহ যাবতীয় বর্জ্য কয়েকটি নদীপথে চলে আসছে সুন্দরবনে। এই চরম জল-দূষণের ফলে সুন্দরবনের গর্ব সুন্দরীগাছ সহ অন্যান্য ম্যানগ্রোভ জাতীয় বৃক্ষের জন্ম ও বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, সমুদ্রের তীরভূমিতে প্রায় প্রবালপ্রাচীরের মতো কাজ করে যে ঝিনুক ও কস্তুরি, তাদেরও আজ আর পাওয়া যাচ্ছে না। বহুকাল ধরেই বিশেষজ্ঞরা শহরাঞ্চলের এইসব দূষিত জল শোধন করে তারপর নদীতে ছাড়ার দাবি জানিয়ে আসছেন, কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেনি। ফলে সরকারি ঔদাসীন্যের কারণেই দূষণ ভয়াবহ মাত্রায় বাড়ছে, মাছ ও ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে।

সাহারার সঙ্গে সরকারের সুন্দরবন লুণ্ঠনের চুক্তি

সরকার সুন্দরবনের জল ও জমি মিলিয়ে ৯০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা একচেটিয়া সংস্থা সাহারা ইন্ডিয়ার হাতে তুলে দিচ্ছে 'ইকোট্যুরিজমের' নামে। এ ব্যাপারে 'মৌ'ও স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। সংবাদে প্রকাশ, এই চুক্তি অনুযায়ী, সাগরদ্বীপের ৩৭১.৩৯ একর, নামখানার লক্ষ্মীপুর আবাদের ২২৬.৪৬ একর, কুলতলীর কৈখালি এলাকার ১৫৭ একর, পাথরপ্রতিমার শ্রীধরনগরের ১১৭ একর এবং গোসাবার ঝড়খালির ২২৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হবে। নদী ও সমুদ্রের লাগোয়া ভেস্টেডল্যান্ডও সরকারি খাসজমি তো বটেই, সেই সঙ্গে পাট্টাদার ও রায়তী জমির মালিককে উচ্ছেদ করে জমি দখলের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এছাড়াও শোনা যাচ্ছে, গোসাবা, সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদের বেশ কিছু এলাকা, রিজার্ভ ফরেস্টের বেনিফেলি জঙ্গল, কলসদ্বীপ, ভগবৎপুর, টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টের ছাইমারি, কেঁদোদ্বীপ, কঙ্কালদ্বীপ, চন্দ্রমুখী ফরেস্ট প্রভৃতি জায়গায় সাহারা প্রকল্পের কাজ হবে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, এইসব অধিগৃহীত জঙ্গলের বিস্তীর্ণ অংশ সাফ করে এবং নদীচড়া ও স্থলভাগের জমিতে দেশি-বিদেশি অর্থবান পর্যটকদের জন্য গড়ে তোলা হবে বিলাসবহুল ঘরবাড়ি, ক্লাব, রেস্তোরাঁ, পাঁচতারা/সাততারা হোটেল, গল্ফ খেলার মাঠ, ক্যাসিনো (জুয়া, মদ ও আনুষঙ্গিক বেলেল্লার আড্ডা) ও মেডিটেশন সেন্টার, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সুপার মার্কেট, হেলিপ্যাড, ওয়াচ টাওয়ার, ফরেস্ট বাংলো, বনের গভীরে যাতায়াতের জন্য সুরক্ষিত রাস্তা ইত্যাদি। নদী ও সমুদ্রের জলে গড়ে তোলা হবে ভাসমান হোটেল, আধুনিক মাল্টি-এথনিক রেস্টুরেন্ট, সুইমিং পুল, ড্যান্সিং ফ্লোর, ক্যাসিনো, যাত্রী ওঠা-নামার জেটি ইত্যাদি। সেজন্য ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বিশাল বিশাল এলাকা ধ্বংস করা হবে, সুন্দরবনের জৈব বৈচিত্র্যের পরিবেশও ধ্বংস হবে। এই যে বিশাল আয়োজন — তার যাবতীয় বর্জ্য, মলমূত্র সমস্ত জমবে সুন্দরবনের নদী-সমুদ্রে। এর ফলে ইতিমধ্যেই দূষিত নদী ও সমুদ্র আরও দূষিত হবে, এবং পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর ৩২টি দূষণমুক্ত স্থানের মধ্যে অন্যতম যে সুন্দরবন — তার দূষণ বাড়বে ভয়াবহ মাত্রায়। পরিণতিতে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের উৎপাদন আরও ব্যাহত হবে; মাছের বিশ্বশ্রেষ্ঠ আঁতুড়ঘর হিসাবে খ্যাত সুন্দরবনে মাছের উৎপাদনও ব্যাহত হবে। যে সরকার নিজেই এই ব্যাপক ধ্বংসের কারিগর, সেই সরকারের মন্ত্রীর মুখে সুন্দরবন বাঁচানোর আহ্বান — একটি চূড়ান্ত ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু হতে পারে কি?

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে 'ইকোট্যুরিজমে'র উদ্যোগ নেওয়া কি অন্যায়? মোটেও নয়, কিন্তু 'ইকোট্যুরিজম' কাকে বলে? দি 'ওয়ার্ল্ড কনজারভেশন ইউনিয়ন' এ প্রসঙ্গে বলেছে, 'প্রকৃত ইকোট্যুরিজমের তাৎপর্য তখনই থাকতে পারে যখন তা প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিকৃত না করে, জীবজগৎ ও তার বৈচিত্র্যকে অক্ষুণ্ণ ও সক্রিয় রেখে, জীবনচক্রের ধ্বংস সাধন না করে, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মকে জেনে তার সমৃদ্ধি ঘটানো হয় ও মানবকল্যাণে তার ব্যবহার করা হয় এবং যখন তা শান্ত স্নিগ্ধ নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করার দৃষ্টিকোণ থেকে, পাশাপাশি স্থানীয় জনমণ্ডলীর নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতি জীবন-জীবিকা অর্থনীতি এবং ঐতিহ্যকে ধ্বংস, অবনমন বা বিকৃত না করে শ্রদ্ধা সহকারে তাকে জানা দেখা ও তার সমৃদ্ধি ঘটানোর সহায়ক হয়।' ফলে তাদের মতে, 'low visitor impact' অর্থাৎ 'দলে দলে পর্যটকের ভিড় না করা' প্রত্যাশিত। কিন্তু সুন্দরবনে সাহারা যে ইকোট্যুরিজম গড়ে তুলতে চলেছে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি তাই? যে আয়োজন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারের সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছে তা দেখলে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তাদের মূল উদ্দেশ্য ইকোট্যুরিজম নয়, তাদের মতলব হল প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসা করা এবং বেশি বেশি পর্যটক টেনে সর্বাধিক মুনাফা লোটা। সে কারণে, সাহারার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সুন্দরবনের শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ বিপন্ন হবে তাই নয়, গ্রামীণ সংস্কৃতি আজও যতটুকু টিকে আছে — এদের মুনাফা লালসায় তাও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে; নিকৃষ্টতম আমোদ-প্রমোদের আড্ডা জমবে এবং রমরমিয়ে চলবে নারীদেহ ব্যবসা; অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া সুন্দরবনের মা-বোনেরা হবেন অর্থবান বিলাসী পর্যটকদের লালসার শিকার — যেমনটি ঘটেছে ক্যারিবিয়ান সমুদ্র এলাকায় ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। কারণ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের বাহানায় পশ্চিমী দেশের তুলনায় এখানে সস্তায় বিকৃত যৌন-ক্ষুধা নিবৃত্ত করার বিলাসবহুল পরিবেশ সৃষ্টি করে বিপুল মুনাফা অর্জনই সাহারার লক্ষ্য। এই ধরনের চেষ্টাকে লক্ষ্য করে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আয়ার বলেছেন, 'ট্যুরিজম বর্তমানে যৌনক্ষুধা মেটানোর মাধ্যম ছাড়া আর কিছু নয়।' সরকার বলছে — সাহারার ট্যুরিজম প্রকল্পের ফলে সুন্দরবন এলাকার মানুষের দারুণ উন্নতি হবে; কিন্তু কী সেই উন্নতি এবং সে জন্য কী কী হতে যাচ্ছে — সেসব তারা প্রকাশ্যে জনসাধারণকে বলতে চাইছে না; চোরের মত চুপিসারে তারা চুক্তি করেছে এবং কাজ করছে।

শুধু সাহারা ইন্ডিয়া নয়, শোনা যাচ্ছে, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার কিছু বহুজাতিক কোম্পানি, টাটা, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক, সাহারা আরব প্রভৃতি সংস্থাও সুন্দরবনে ঢুকতে চলেছে। এদের কেউ করবে ফুলের চাষ, কেউ তৈলবীজের চাষ, কেউ মাছ-কাঁকড়ার হ্যাচারি, কেউ মধু উৎপাদন ও সংগ্রহ। কেউ আবার কৃত্রিম উপায়ে পশুপাখির প্রজনন কেন্দ্র ইত্যাদি প্রকল্প গড়ে তুলবে। অর্থাৎ সুন্দরবন হতে চলেছে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক পুঁজির অবাধ লুণ্ঠনের মৃগয়াক্ষেত্র। এর নাম নাকি 'সুন্দরবন বাঁচাও'!

একদিকে মুখ্যমন্ত্রীর বাণী অন্যদিকে সুন্দরবনবাসীর ভয়াবহ দুর্দশা

বকখালির সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'সুন্দরবনের ১৯টি ব্লকে সেচ বিদ্যুৎ ব্রিজ এবং নদীবাঁধের কাজ হবে।' তিনি জোর দেন 'সেচের সুযোগ বাড়ানোর উপর, গরিব মানুষের উপার্জন বৃদ্ধির উপর, মাছ চাষে আরও কীভাবে অর্থ উপার্জন বাড়ানো যায়' তার উপর (গণশক্তি ২৭-৩-০৫)। ভাষণ শুনলে মনে হবে, সুন্দরবনবাসীর আর্থিক উন্নতিবিধানে তথা তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটাতে সরকার কতই না আন্তরিক! সত্যিই কি তাই? সরকারের ইতিমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপগুলিতে কি সেই আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে?

সবাই জানেন, সুন্দরবন এলাকায় কোন কারখানা আজও গড়ে ওঠেনি। জমিতে ধান পান লঙ্কা তরমুজ ইত্যাদি চাষ করে একটা বিরাট অংশের মানুষ বাঁচার চেষ্টা করছে। বাজারে সার বীজ কীটনাশকের চড়া দর, অথচ উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দামটুকু পাচ্ছে না চাষীরা। খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পও নেই, হিমঘরও নেই। ফলে বাজারে ফড়ে দালালদের যথেচ্ছাচারের শিকার হচ্ছে অসহায় চাষীরা। সব দেখেও সরকার ও প্রশাসন কিন্তু বিপন্ন চাষীদের বাঁচানোর কোন ব্যবস্থা করছে না।

চাষীদের কাছে চাষ এখন অলাভজনক। প্রতিবছরই লোকসান। ঋণে ডুবে যাচ্ছে চাষীরা। গরিব চাষী আর জমি ধরে রাখতে পারছে না। দারিদ্র্যের জ্বালা মেটাতে, ঋণ শোধ করতে, চিকিৎসার খরচ সামাল দিতে তাদের জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বাসন্তী, সন্দেশখালি, মীনাখাঁ সহ বিভিন্ন ব্লকের বহু কৃষিজমিতে আর কৃষিকাজ হচ্ছে না; কিছু থোক টাকার বিনিময়ে জমিগুলো লোনা ফিসারির মালিক ও ইঁটভাটার মালিকদের ২০ বছরের লিজে দিতে বাধ্য হচ্ছে বিপন্ন চাষীরা। কিন্তু ৭/৮ বছরের মধ্যেই মালিকরা মুনাফা তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, জমিকে করে যাচ্ছে নিষ্ফলা। কারণ, ব্যাপক সার ও ওষুধ ব্যবহারের কারণে কৃষিকাজ দূরের কথা ফিসারির জমিতে মাছচাষও করা যাচ্ছে না এবং ইঁট ভাটার ক্ষেত্রগুলিতে বিশাল বিশাল খাদ ছাড়া বিশেষ কিছু থাকছে না। গরিব প্রান্তিক চাষীরা এইভাবে কার্যত যে ভূমিহীনে পরিণত হচ্ছে — তা কি সরকার ও প্রশাসন জানে না? সবই জানে। তবু তারা গরিব প্রান্তিক চাষীদের রক্ষায় এগিয়ে আসছে না।

এদিকে, জনসংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছে, কিন্তু জমি বাড়ছে না। আবার, চাষের কাজে বলদে টানা লাঙ্গলের জায়গা নিয়েছে পাওয়ার-টিলার (মেশিন লাঙ্গল)। ফলে মাঠেও কাজ কম। মানুষ যাবে কোথায়? রুজি-রোজগারের সন্ধানে ঘর-বাড়ি স্ত্রী-সন্তান ছেড়ে তারা চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে হুগলি ও বর্ধমানের ধান কলে, আলুর স্টোরে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাদের পরিবার ভেঙে দিচ্ছে। তাদের যেতে হচ্ছে আরও বহু দূরে আন্দামান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, দিল্লিতে। সেখানে কেউ ভ্যান-রিক্সা টানছে, কেউ দোকানে কাজ করছে,

চারের পাতায় দেখুন

সুন্দরবন বাঁচাতে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলুন

তিনের পাতার পর

পথঘাট সেতু বিল্ডিং তৈরির শ্রমিকের কাজ করছে, ও এন জি সি'তে কাজ করছে। মেয়েরা চলে যাচ্ছে শহরে বাবুর বাড়িতে কাজ করতে, না হয় পথের ধারে শাকপাতা বিক্রি করতে। হেনস্থার তাদের অন্ত নেই। সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতি ও শ্রমজীবী মহিলা সমিতি ছাড়া তাঁদের সমব্যথী কেউ নেই বললেই চলে। আবার, সবাই দূরে বা ভিন্ রাজ্যে যেতে পারে না, সে সুযোগও সীমিত। তাই সুন্দরবনের শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশি মানুষ নদী ও সমুদ্রে মাছ, মীন, কাঁকড়া ধরে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সরকারি ও প্রশাসনিক হানাদারি আঘাত হানছে। সুন্দরবনের বেশিরভাগ জায়গাকে আজ টাইগার প্রোজেক্ট এবং কোর এরিয়া হিসাবে চিহ্নিত করে সরকার সেসব জায়গায় মৎস্যজীবীদের মাছধরা নিষিদ্ধ করেছে। এই মাছধরার অধিকার একসময় ইংরেজ সরকার খর্ব করতে চেয়েছিল; সেই সময় রানি রাসমণির নেতৃত্বে মৎস্যজীবীরা আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার কায়েম রেখেছিল। রাজ্যের সিপিএম সরকার আজ সেই অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে টাইগার প্রোজেক্ট ও বনদপ্তরের অত্যাচার; তারা মৎস্যজীবীদের থেকে হাজার হাজার টাকা জরিমানা আদায় করছে, শত শত নৌকা-জাল আটক করে নষ্ট করে দিচ্ছে, মাছ-কাঁকড়া কেড়ে নিচ্ছে, অমানুষিক মারধোর করছে। প্রশাসনিক আক্রমণে বহু শুখাখুঁটি (মাছ শুকনো করার কারবার) উঠে যেতে বাধ্য হয়েছে। জলদূষণ ও দেশি-বিদেশি বহুজাতিক সংস্থার ট্রলি ও জাহাজের যথেচ্ছ মৎস্য শিকারের কারণে নদী-সমুদ্রে মাছের পরিমাণও কমছে। এইসব ট্রলি জাহাজের আক্রমণে অনেক মৎস্যজীবীর জাল ও ট্রলার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মৎস্যজীবীরা তাই লোকসান গুণতে গুণতে দেনার পাহাড় মাথায় নিয়ে কেউ কেউ পাগল হয়ে হচ্ছে, কেউবা আত্মহত্যার পথে যাচ্ছে। ট্রলার, নৌকো, জাল ফেলে দিয়ে বহু মৎস্যজীবী অন্য জীবিকার সন্ধানে ছুটছে। ১৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ট্রলার ও জাল মাত্র দেড় লক্ষ টাকায় এবং ৬০-৭০ হাজার টাকা মূল্যের নৌকো ও জাল মাত্র ১০ হাজার টাকায় বেচে দিতে চাইছে, কিন্তু কেনবার লোক নেই — এমনই পরিস্থিতি! তার ফলে, মাছ ধরা, মাছ পরিবহণ, মাছ কেনা-বেচা, মাছ ধরার সাজ-সরঞ্জাম তৈরি, শুখাখুঁটি প্রভৃতি কাজে যে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ যুক্ত — তারাও বিপন্ন। মুখ্যমন্ত্রী বক্তৃতায় বলেছেন, জোর দেওয়া হবে 'গরিব মানুষের উপার্জন বৃদ্ধির উপর, এবং মাছ চাষে আরও কীভাবে অর্থ উপার্জন বাড়ানো যায়' তার উপরে। এ তো বক্তৃতার কথা, তিনি সুনির্দিষ্ট করে বলুন — কী সেই নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া? তা কিন্তু তিনি বলছেন না, এবং সেজন্য কিছু করছেনও না।

কৃষিতে সেচের প্রশ্নে সরকারি ধাপ্পা

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, জোর দেওয়া হবে সেচের সুযোগ বাড়ানোর উপর। কথাটা শুনলে মনে হবে যে, ইতিমধ্যে সুন্দরবন এলাকায় সরকার সেচের ব্যবস্থা করেছে, এবার সেটাকে বৃদ্ধি করবে। এ এক বিরাট ধাপ্পা। গত ২৭ বছরের রাজত্বে সেচের কোন ব্যবস্থাই তারা করেনি, তার আবার বৃদ্ধি কি? নদী ও সমুদ্রের লোনাজলকে মিঠা জলে রূপান্তরিত করে সেচের ব্যবস্থা করতে তারা পারত কিন্তু করেনি; হাজা-মজা খালগুলিকে সংস্কার করে বৃষ্টির জল ধরে রেখে সেচের কাজে লাগাতে পারত, তাও করেনি। তাহলে তারা করেছে কী? তারা যেটা করেছে সেটা হল — জনগণের থেকে নিঙড়ে নেওয়া ট্যাক্সের টাকা ব্যয় করে পিয়ালি নদী বেঁধে জলাধার নির্মাণ। বলা হয়েছিল, এই জলাধার থেকে বারুইপুর, জয়নগর, ক্যানিং ও কুলতলীর চাষীরা সেচের জল পাবে। কিন্তু তার কিছুই হয়নি। সেই জলাধারের জল খালের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে টেনে নিয়ে যাওয়ার কোন ব্যবস্থাই তারা করেনি, ফলে সেচের ব্যবস্থাও হয়নি। অন্যদিকে, নদী বেঁধে দেবার পরিণামে বিরাট অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস হয়েছে, মাছ ধরার ক্ষেত্র নষ্ট হয়েছে, মৎস্যজীবীরা উচ্ছেদ হয়েছে, মাছের কাজে নিযুক্ত বহু পরিবার তাদের রুজি-রোজগার হারিয়েছে, এবং এই নদীর দু-পাশে গড়ে ওঠা হাট-বাজার আজ মৃতপ্রায়। সেচের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসীর এই মহা উপকারটি তারা করেছে। সম্প্রতি কুলতলী ব্লকের প্রায় ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ হুকাহারানিয়া নদী বেঁধে যে জলাধার নির্মাণে তারা উদ্যোগী হয়েছে তারও পরিণতি হবে পিয়ালী জলাধারের মত। তারা কিন্তু গ্রামে গ্রামে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য খাল কাটার কোন ব্যবস্থা করল না, তার আগেই এই নদী বেঁধে ফেলতে চলেছে। এই নদীটি ঠাকুরাণী ও মাকড়ি নদীর সংযোগরক্ষাকারী স্রোতস্বিনী নদী। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই নদী বেঁধে দিলে এর উপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবী সহ অন্যান্য মানুষের জীবন-জীবিকা ধ্বংস হবে, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা দেখা দেবে, ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস হবে, এবং ঢাকীর হাট, রায়দীঘি সহ সুন্দরবনের নানা এলাকার বাজারে কৃষিপণ্য ও মাছ নিয়ে যাওয়ার সহজ রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত এই জলপথটি বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ধ্বংস ও সর্বনাশের একটা দীর্ঘকালীন ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যতদূর জানা যাচ্ছে, নদী বেঁধে এটিকে একটি মেছোঘেরি বানিয়ে তা থেকে পছন্দের লোকজন যাতে মুনাফা লুটতে পারে — ওখানে সেই ব্যবস্থাই করা হচ্ছে। এর নাম কি সুন্দরবনবাসীকে রক্ষার ব্যবস্থা?

নদী-সমুদ্রের ভাঙন নেতা-মন্ত্রী ঠিকাদার মুনাফা লুঠছে

আর নদীবাঁধ মেরামত? গোটা সুন্দরবনের অবস্থা ভয়াবহ। নদীবাঁধগুলি জীর্ণ; প্রতি বছর ভাঙছে, এবং বর্ষাকালে জলোচ্ছ্বাসে ও প্লাবনে বাঁধ ভেঙে যাবার পরে, আগে নয়, সরকার সেখানে টাকা ঢালছে। ফলে, সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা, তাদের উপকারের পরিবর্তে ঠিকাদার সহ স্তরে স্তরে অফিসারদের পকেট ভরছে এবং রাইটার্স পর্যন্ত বিস্তৃত দুর্নীতি-চক্র নাকি সেই টাকার ভাগ পায়। পরের বছর আবার বাঁধ ভাঙ্গছে, তারপর আবার টাকার খেলা। ফলে নদীবাঁধ ভাঙলেই যেখানে মুনাফা, সেখানে নদীবাঁধ উপযুক্তভাবে মেরামত হোক — এটা সরকার ও প্রশাসন কেউ চায় কি?

ইতিমধ্যে সাগর ব্লকের লোহাচড়া ও সুপারিভাঙা দ্বীপ দুটি সাগরের ঢেউয়ের ধাক্কায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ৬ হাজার মানুষ ভিটেমাটি হারিয়ে উদ্বাস্তু। ঘোড়ামারা দ্বীপটির অস্তিত্ব বিপন্ন। সমুদ্র ক্রমাগত এগিয়ে আসছে, দ্বীপ ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। পাথরপ্রতিমা ব্লকের গোবর্ধনপুরের অবস্থাও তাই, মানুষ এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই দ্বীপগুলি রক্ষার কোন উদ্যোগ সরকারের নেই। সুন্দরবন এলাকার আরও বিভিন্ন লোকালয়ের উর্বর জমি, ঘরবাড়ি, স্কুল ইত্যাদি প্রতি বছরই চলে যাচ্ছে নদীর গর্ভে। সরকার ও প্রশাসন পশ্চাদপসরণের নীতি অনুসরণ করছে; নদী সংলগ্ন এলাকা ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এসে নতুন করে বাঁধ দিচ্ছে। এ হল প্রতিবছরের কাহিনী। পলি জমে নদীগুলোতে চড়া পড়ে যাচ্ছে; একদিকে চড়া পড়ে গেলে জলস্রোত অন্যদিকে ঘুরে লোকালয় ভেঙে ঢুকে যাচ্ছে। ড্রেজারের সাহায্যে নদীর এই পলি কেটে সরিয়ে নদীর স্রোত যাতে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা আজকের আধুনিক যুগে মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু সরকার ও প্রশাসন সেটি করছে না; বরং তাদের যুক্তি — ঐ এলাকা থেকে সরকারের কী এমন আয় হয় যে, এত টাকা খরচ করতে হবে! কী অপূর্ব জনদরদ! জনগণ ট্যাক্স দিচ্ছে, সেই ট্যাক্সের টাকায় সরকার চলছে, মন্ত্রীদের উজীরী-আমিরী চলছে; বিনিময়ে জনগণকে, তাদের জীবন-জীবিকা-জমি-সম্পত্তিকে সরকার রক্ষা করবে — এটাই তো স্বাভাবিক; তা যদি না করে তবে সেই সরকার মানুষের কোন্ কাজে লাগবে? তারা পুলিশ-মিলিটারির বাজেট বাড়িয়ে চলেছে দরাজ হাতে, বৃহৎ পুঁজির ব্যবসাদারদের বিপুল কর ছাড় ও ভরতুকি দিচ্ছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার ক্ষেত্রে বলছে — টাকা নেই। এরা নাকি বামপন্থী!

লুঠেরা পুঁজিপতিদেরই স্বার্থে কিছু ব্রিজ ও রাস্তা বানাতে চাইছে সরকার

সুন্দরবনকে অর্থবান ট্যুরিস্টদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে এবং বৃহৎ পুঁজির মালিকরা তাদের পুঁজির ফাঁদ যাতে একেবারে গ্রামের অত্যন্ত ভিতরে আরও সুদৃঢ়ভাবে পাততে পারে — সেটাই এখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রধান লক্ষ্য। সেকারণে কিছু কিছু ব্রিজ-রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণে তারা গুরুত্ব দিচ্ছে। ব্রিটিশও এদেশে রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, রেল লাইন গড়ে তুলেছিল; তা থেকে সাধারণ মানুষ কিছু সুবিধাও পেয়েছিল। তবু তাদের এদেশ থেকে তাড়ানো হয়েছিল। কারণ, তাদের এসব করার উদ্দেশ্য জনকল্যাণ ছিল না, উদ্দেশ্য ছিল — এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির স্বার্থরক্ষা। এদেশের পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার মূল লক্ষ্যে কংগ্রেসও ক্ষমতায় বসে রাস্তাঘাট ব্রিজ ইত্যাদি করেছে।

সেই ব্রিটিশ আমলে দেশময় রেললাইন পাতবার পেছনে ব্রিটিশের যে মতলব ছিল, তার পর্দা ফাঁস করে দিয়ে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডে যা বলেছিলেন, সেটি এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, '....দিঘি নেই, পুকুর নেই, কুয়ো নেই, কোথাও একফোঁটা খাবার জল নেই, গ্রীষ্মকালে গরু-বাছুরগুলো জলাভাবে ধড়ফড় করে মরে যায়....। ম্যালেরিয়া, কলেরা হর-রকমের ব্যাধি পীড়ায় লোক উজাড় হয়ে গেল, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কর্তারা আছে শুধু রেলগাড়ি চালিয়ে কোথায় কার ঘরে কি শস্য জন্মেছে শুষে চালান করে নিয়ে যেতে। ...শুধুমাত্র এই হেতুই ভারতের দিকে দিকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলপথ বিস্তারের আর বিরাম নাই। বাণিজ্যের নাম দিয়া ধনীর ধনভাণ্ডার বিপুল হইতে বিপুলতর করিবার এই অবিরাম চেষ্টায় দুর্বলের সুখ গেল, শান্তি গেল, অন্ন গেল, ধর্ম গেল — তাহার বাঁচিবার পথ দিনের পর দিন সঙ্কীর্ণ ও নিরন্তর বোঝা দুর্বিষহ হইয়া উঠিতেছে....। আগে বিশ ক্রোশের মধ্যে রেলগাড়ি ছিল না, তখন কি সস্তা, আর কি প্রচুর জিনিসপত্রই না সেখানে ছিল। তখন কারও কিছু জন্মালে পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তার একটু ভাগ পেত; এখন থোড়, মোচা, উঠানের দু-আঁটি শাক পর্যন্ত কেউ কাউকে দিতে চায় না, বলে — থাক, সাড়ে আটটার গাড়িতে পাইকারের হাতে তুলে দিলে দু-পয়সা আসবে। এখন দেওয়ার নাম হয়েছে অপব্যয় — মশাই, দুঃখের কথা বলতে কি, পয়সা করার নেশায় মেয়ে-পুরুষে সবাই যেন একেবারে ইতর হয়ে গেছে। আবার আপনারাই কি প্রাণভরে ভোগ করতে পায়? পায় না। শুধু ত আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী নয়, নিজেদেরও সকল দিক দিয়ে ঠকিয়ে ঠকিয়ে টাকা পয়সাটাই হয়েছে যেন তাদের একটিমাত্র পরমার্থ।.... শিরার মত দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রেলের রাস্তা যদি না ঢুকতে পেত, খাবার জিনিস চালান দিয়ে পয়সা রোজগারের এত সুযোগ না থাকত, আর সেই লোভে মানুষ যদি এমন পাগল হয়ে না উঠত, এত দুর্দশা দেশের হোতো না।....। এই রেল, এই কল, এই লোহা-বাঁধানো রাস্তা — এই ত হল পবিত্র vested interest — এই গুরুভারেই ত সংসারে কোথাও গরিবের নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা নেই।'

ফলে শুধুমাত্র কিছু রাস্তা, ব্রিজ গড়লেই তাকে সাধারণ মানুষের স্বার্থে উন্নয়ন বলা চলে না। এর সঙ্গে দেখতে হবে, সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষার কী কী সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা হচ্ছে, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-লুণ্ঠনের থেকে, প্রতিদিনের জীবনযন্ত্রণা থেকে মানুষকে রক্ষার কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ধোঁকা না দিয়ে, সরকার যদি সুন্দরবনকে ও সুন্দরবনবাসীকে সত্যিই বাঁচাতে চায় তাহলে এখনই তাদের কিছু কাজ করতে হবে (১) ট্যুরিস্ট-লজ, বাংলো, টাওয়ার, জেটি ইত্যাদি বানানোর উদ্দেশ্যে ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংসের সর্বনাশা সরকারি প্রকল্প অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে; ম্যানগ্রোভ অরণ্য আরও বৃদ্ধির জন্য বক্তৃতা নয়, বাস্তবানুগ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; (২) সাহারা সহ মুনাফা শিকারি দেশি-বিদেশি কোম্পানিগুলোর হাতে সুন্দরবনকে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে; (৩) শহরাঞ্চলের দূষিত বর্জ্যযুক্ত জল শোধন করে তবেই সুন্দরবনের নদীতে যাতে ছাড়া হয়; তার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করতে হবে; (৪) নদী, খাঁড়ি ও সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের মাছ, মীন ও কাঁকড়া ধরার অধিকার খর্ব করা চলবে না, তাদের উপর প্রশাসনিক অত্যাচার বন্ধ করতে হবে; এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলির উচ্চপ্রযুক্তিসম্পন্ন ট্রলি ও জাহাজের দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে হবে; (৫) সুন্দরবনের নদী ও খাঁড়ির পলি সরিয়ে নাব্যতা রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে; (৬) নদীবাঁধগুলিকে উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা মেরামত করে সমুদ্র ও নদীর করাল গ্রাস থেকে দ্বীপগুলিকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে; (৭) ভাঙনে সর্বস্বান্তদের পুনর্বাসন সহ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে; (৮) জল নিকাশী ও দোফসলী চাষের জন্য মজা-হাজা খাল সংস্কার, ব্লকোজারগুলোর সঙ্গে যুক্ত করে খাল কাটা, এবং লোনা জলকে মিঠা জলে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা করতে হবে; (৯) চাষী যাতে বীজ সার ও কীটনাশক সস্তাদরে কিনতে পারে এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পেতে পারে — তা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং বাজারে ফড়ে দালালদের আধিপত্য দমনের লক্ষ্যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে; (১০) কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য হিমঘর স্থাপন এবং কৃষিভিত্তিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ- ভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলতে হবে; (১১) প্রয়োজন মতো উপযুক্ত হাসপাতাল নির্মাণ সহ, যেগুলি এখন আছে সেখানে প্রয়োজনীয় ডাক্তার নার্স ও ওষুধপত্র এবং জলে ও স্থলে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে; প্রতিটি গ্রামীণ হাসপাতালে কুকুর ও সাপে কামড়ানোর ওষুধ পর্যাপ্ত সরবরাহ করতে হবে; (১২) প্রয়োজনমত স্কুল ও কলেজ সহ অবৈতনিক শিক্ষাদানের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ন্যূনতম প্রয়োজনীয় এই কাজগুলি করে তার সঙ্গে রাস্তাঘাট ও ব্রিজ যুক্ত হলে তবেই জনকল্যাণের ক্ষেত্রে তার একটি যথার্থ কার্যকারিতা থাকে। তা না হলে শুধু কিছু রাস্তাঘাট ও ব্রিজ নির্মাণ এবং তার সঙ্গে ইকোট্যুরিজম — এটা বাস্তবে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানির সামনে সুন্দরবন লুণ্ঠনের সিংহদুয়ার উন্মুক্ত করে দেওয়ারই প্রকল্প এবং সরকার সেই কাজই করে চলেছে।

সুন্দরবনবাসী প্রতিরোধ গড়ে তুলছে

সুন্দরবনের মানুষ সরকারি সর্বনাশা ছকের অনেকটাই ধরতে পেরেছেন। বহুক্ষেত্রে তাঁরা

ছয়ের পাতায় দেখুন

মে দিবসের আহ্বান

শ্রমিক আন্দোলনকে অর্থনীতিবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করুন

১৮৮৬ সালের ১ মে থেকে ৩ মে, শিকাগোর হে মার্কেটের লড়াই, ধর্মঘটি শ্রমিকের রক্তস্রোত, শ্রমিক নেতা পার্সনস্, স্পাইজ ফিসার ও এঙ্গেলের আত্মদান কম্পন ধরিয়েছিল বিশ্বপুঁজির শিরোমণিদের বুকে ; সর্বহারা শ্রমিকদের জীবনে এনেছিলো আলো। অর্জিত হয়েছিল ৮ ঘণ্টা শ্রমের অধিকার। বিশ্বব্যাপী শ্রমিকরা প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পেরেছিলো পুঁজি নয় শ্রমই উৎপাদন ব্যবস্থার আসল নিয়ামক শক্তি। শ্রম ব্যাতিরেকে গোটা উৎপাদন ব্যবস্থা স্তব্ধ। তাই সমস্ত শাসকরাই শ্রমের প্রকৃত সামাজিক অর্থনৈতিক তাৎপর্যকে অস্বীকার করে মজুরিটুকু দিয়ে শ্রমশক্তির পরিমাপ করতে চায়। আজ সঙ্কটগ্রস্ত বিশ্বপুঁজি বিশ্বায়নের নামে ছিনিয়ে নিতে চলেছে মে দিবসের অর্জিত ৮ ঘণ্টা শ্রমদিবসের অধিকার। মালিকের দাবি শ্রমদিবস হোক ১০/১২ ঘণ্টা বা আরো বেশি। পুঁজিবাদের স্তাবকরা বাস্তবতার দোহাই দিয়ে ও উন্নয়নের অলীক স্বপ্নময় গল্প রচনা করে শ্রমিকদের ভুল বোঝাচ্ছে। শ্রমিক আন্দোলনকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছে। পশ্চিমবাংলাতেও একদিকে উন্নয়নের নামে ফ্রি ইকনমিক জোন (অবাধ অর্থনৈতিক অঞ্চল)গড়ে তোলা হচ্ছে। যেখানে শ্রমিকের থাকবে না কোন নির্দিষ্ট শ্রমদিবস, চাকরির নিরাপত্তা। পুঁজিপতির প্রয়োজন অর্থাৎ তথাকথিত 'উন্নয়নের' প্রয়োজনই শেষ কথা। সেখানে প্রশ্ন তোলার অধিকার থাকবে না — উন্নয়ন কার স্বার্থে? উন্নয়নের প্রবক্তা আজ এরা সকলেই, পোষাক সাদা হোক বা অন্য কিছু। ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতা প্রত্যাশী সব নেতাই আজ 'উন্নয়নের' স্তাবক। এরা দেশিবিদেশি পুঁজির অনুগ্রহ পাবার আশায় কোটি কোটি অসংগঠিত ও সংগঠিত শ্রমিককে মালিকদের হাতে অবাধ শোষণের জন্য তুলে দিচ্ছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে পরিচালিত ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী এই ভয়াবহ আক্রমণের মোকাবিলায় মে দিবসের শিক্ষার ভিত্তিতে অর্থনীতিবাদ, সংস্কারবাদ থেকে শ্রমজীবী মানুষকে মুক্ত করে শ্রেণীচিন্তা ও শ্রেণীচেতনা গড়ে তুলবার লক্ষ্যে দার্জিলিং-এর পাহাড়ে চা শ্রমিক থেকে শুরু করে সাগরের মৎস্যজীবী শ্রমিকদের মধ্যে মে দিবসের বার্তা নিয়ে যায়। সর্বত্র প্রবল উদ্দীপনায় পালিত হয় মে দিবস। সর্বত্র রক্তপতাকা উত্তোলন করে শহীদদের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের নয়া আক্রমণ রুখতে শ্রমিক আন্দোলনকে শোধনবাদ-সংস্কারবাদ থেকে মুক্ত করে জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলবার শপথ নেওয়া হয়। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী রাজ্য অফিসে সকালে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন কমরেড দীপক দেব।

বাম কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির আহ্বানে কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে মে দিবসের সভায় বক্তব্য রাখছেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা

যৌথ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলবার প্রচেষ্টায় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী তার সূচনাপর্ব থেকেই আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসে বিকাল ৪টায় কলকাতা শহীদ মিনার ময়দানে বাম কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির আহ্বানে এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশ হয়। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তব্য রাখেন। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নেতৃত্বে রক্তপতাকা ও দাবিসম্বলিত ফেস্টুনে সুসজ্জিত কয়েকটি মিছিল কলকাতার পথ পরিক্রমা করে সভায় উপস্থিত হয়। এই সভায় ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, শ্রমিক আন্দোলন প্রথম থেকেই দুটি ধারায় বিভক্ত। একটি ধারা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙের ধারা, যে ধারা শ্রমিক আন্দোলনকে অর্থনীতিবাদ থেকে মুক্ত করে শ্রেণীচেতনার ভিত্তিতে সমাজ পরিবর্তনের পরিপূরক করে গড়ে তুলেছে, শ্রমিক আন্দোলনকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অনুশীলন কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলে শ্রমিকশ্রেণীকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে, গড়ে তুলেছে শোষণহীন সমাজ, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতন্ত্র। অপর একটি ধারা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার আন্দোলনের বেড়াজালে আবদ্ধ রেখে শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপস করে চলেছে। এই ধারাই আজ বিশ্বব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনেকে প্রধানত প্রভাবিত করে রেখেছে। ভারত বা পশ্চিমবঙ্গ তার বাইরে নয়। মালিকেরা আজ এই ধারার নেতাদের বাহবা দিচ্ছে। নেতারাও খুব খুশি হচ্ছেন। এই ধরনের শ্রমিক নেতাতেই আজ দেশ ভরে গেছে। শ্রমিকরা আজ জানতে চাইছেন, এই সব 'দায়িত্বশীল' নেতাদের দায়বদ্ধতা কাদের প্রতি। মালিকরা আজ তীব্র বাজার সংকটের সমস্ত বোঝা শ্রমিকদের কাঁধে চাপিয়ে মে দিবসের অর্জিত অধিকার হরণ করে ১২ ঘণ্টা কাজ করাচ্ছে, সকলকে শোনাচ্ছে উন্নয়নের স্বপ্ন, দিচ্ছে না ন্যূনতম বেতন ও সামাজিক সুরক্ষা, চাকরির কোন নিরাপত্তা নেই। এই উন্নয়ন কার উন্নয়ন? আজকের যুগে সর্বগ্রাসী আক্রমণ থেকে বাঁচতে শ্রমিক আন্দোলনকে অর্থনীতিবাদ থেকে মুক্ত করে শ্রেণীসংগ্রামের ধারায় গড়ে তুলতে হবে। শ্রমিকদের তাঁদের কাছ থেকেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ শিখতে হবে যাঁরা ব্যক্তিজীবনে মার্কসবাদ লেনিনবাদ গ্রহণের সংগ্রাম করছেন।

সভায় অন্যান্য বামপন্থী শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

খেতমজুরদের মে দিবস উদ্‌যাপন

গত ১লা মে খেতমজুর ইউনিয়নের আহ্বানে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার হরিরহাট বাজারে এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন সুকুমার সরকার। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক, রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্য দেবেন্দ্রনাথ বর্মন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই দলের তুফানগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক সান্ত্বনা দত্ত, হরিরহাট হাইস্কুলের শিক্ষক বিনোদবিহারী বর্মন, শশীভূষণ অধিকারী প্রমুখ। বক্তারা মে দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন ৮ ঘণ্টা কাজের দাবি আজও অবহেলিত। চা বাগানে আজও ৬ দিন কাজ করিয়ে ৩ দিনের মজুরি দেওয়া হয়। তাঁরা বলেন, সভ্যতার স্রষ্টা শ্রমিক, তাদের শ্রমে সভ্যতা এগোয় অথচ সেই শ্রমিকই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অনাহারে মরে ; পুঁজিপতিশ্রেণী মুনাফার পাহাড় গড়ে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থাপনের মধ্যেই রয়েছে শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির পথ। সভার শুরুতে খেতমজুর ইউনিয়নের সম্পাদক রত্নেশ্বর অধিকারী স্বরচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বাঁকুড়া জেলা ছাত্র সম্মেলন

শিক্ষায় বর্ধিত ফি ও ডোনেশন প্রত্যাহারের দাবিতে এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেবার সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গত ৭ মে এ আই ডি এস ও'র উদ্যোগে বাঁকুড়া জেলা তৃতীয় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই দলের বাঁকুড়া জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড জয়দেব পাল। প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই ডি এস ও'র রাজ্য সম্পাদক কমরেড নভেন্দু পাল। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সভার সভাপতি ডি এস ও'র বাঁকুড়া জেলা সভাপতি কমরেড দিলীপ কুণ্ডু এবং জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির কোলে।

কেন্দুয়াডিহী বয়েজ হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন কমরেড নভেন্দু পাল, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তমাল নন্দ ও কমরেড সুচেতা কুণ্ডু এবং এ আই ডি ওয়াই ও'র রাজ্য সম্পাদক কমরেড স্বপন দেবনাথ। কমরেড কৃপাসিন্ধু কর্মকারকে সভাপতি এবং কমরেড সাবিরুদ্দিন ভুঁইয়াকে সম্পাদক করে ১২ জনের জেলা কমিটি ও ১১ জনের জেলা কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়।

হুগলি

ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ৬০তম বার্ষিকী পালন

গত ৮ মে শ্রীরামপুরে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট ফোরামের হুগলি জেলা শাখার উদ্যোগে ফ্যাসিবাদের পরাজয় এবং মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট লালফৌজের বিজয়ের ৬০তম বার্ষিকী স্মরণে প্রকাশ্য সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা প্রদীপ দত্ত।

সভায় মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন তপন দাস। প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা দিলীপ ভট্টাচার্য, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ফোরামের হুগলি জেলা কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক অলোক দত্ত, প্রদ্যুৎ চৌধুরী এবং বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা সুরজিৎ দেবরায়।

প্রস্তাবে মানবসভ্যতাকে অনিবার্য বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে মহান মার্কস-লেনিনের সুযোগ্য উত্তরসূরী কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় এবং বর্তমান বিশ্বে ফ্যাসিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত গণতন্ত্রপ্রেমী, শান্তিকামী মানুষের সর্বব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করার আহ্বান জানানো হয়।

হাওড়া

ছাত্র আন্দোলনের জয়

শিল্পনগরী হাওড়ার বহু কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। হাজার হাজার মানুষ বেকার। তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে মানুষ দিন গুজরান করছে। এইরকম পরিস্থিতিতে জেলার বহু স্কুলে ছাত্রভর্তির সময় ৫০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত ডোনেশন এবং সরকার নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত ফি নেওয়া হচ্ছে। অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলার বহু স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় এবং কিছু স্কুলে ছাত্র-অভিভাবকদের নিয়ে ফি-বৃদ্ধি ও ডোনেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয়। আন্দোলনের চাপে শ্যামপুর দ্বারকানাথ বালিকা বিদ্যালয়ে ডোনেশন ২৭০ টাকা থেকে কমিয়ে ১৪০ টাকা এবং কালিদহ অক্ষয়কুমার হাইস্কুল ১১৪ টাকা থেকে কমিয়ে ৫০ টাকা করেছে। বাগনান হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ বাধ্যতামূলক ডোনেশন ২১০ টাকা দেওয়ার শর্ত তুলে নিয়েছে। শিবপুর হিন্দী হাইস্কুল সকল ছাত্রের কমপিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং কমপিউটার ফি না দিতে পারার জন্য পরীক্ষার রেজাল্ট দেওয়া বন্ধ করেছিল। আন্দোলনের ফলে কর্তৃপক্ষ রেজাল্ট দিতে বাধ্য হয় এবং বাধ্যতামূলক কমপিউটার শিক্ষার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়।

গত ৬ মে বর্ধিত ফি প্রত্যাহার, ডোনেশন নেওয়া বন্ধ, হিন্দী ও উর্দুভাষী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল খোলা সহ ১১ দফা দাবিতে কমরেড শুকদেব বারিকের নেতৃত্বে হাওড়া জেলা স্কুল পরিদর্শকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে ডি আই বাড়তি ফি ও ডোনেশন আদায় বন্ধ করার জন্য সার্কুলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

‘সমাজতন্ত্রের সংকট ও মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা’ বিষয়ে আলোচনা সভা

১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসে ‘সমাজতন্ত্রের সংকট ও মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা’ শীর্ষক এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এস ইউ সি আই দলের হাওড়া টাউন কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় দলের কর্মী-সমর্থক ছাড়াও অন্যান্য বামপন্থী দলের বেশ কিছু প্রবীণ মানুষ ও যুবকর্মী উপস্থিত ছিলেন। হাওড়া শহরের বামপন্থী আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ দত্ত এই সভার কাজ পরিচালনা করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু।

কমরেড বসু তাঁর বক্তব্যের সূচনায় বলেন, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বেতনভুক কলমচিরা যতই প্রচার করুক যে, সোভিয়েট রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, চীন ও অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় প্রমাণ করে দিয়েছে মার্কসবাদ ব্যর্থ ও বাতিল হয়ে যাওয়া একটি আদর্শমাত্র, তারা নিজেরাই অন্তর দিয়ে সেকথা বিশ্বাস করে না। একথা ঠিক যে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী অনেক মানুষ নানা বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। কিন্তু যাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছেন, তাঁরা জানেন, মার্কসবাদ যেমন একদিকে প্রমাণ করে দিয়েছে — শ্রেণী সংগ্রামের ক্রমবিকাশের ধারায় শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণই মানবসভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তেমনি আবার এ সত্যও তুলে ধরেছে যে, মার্কসবাদের যুগোপযোগী সঠিক উপলব্ধির ভিত্তিতে শ্রেণীসংগ্রামকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে না পারলে বিপ্লবী আন্দোলনে সাময়িক বিচ্যুতি, এমনকী বিপর্যয় ঘটাও অস্বাভাবিক নয়।

তিনি বলেন, যুগ যুগ ধরে যে নির্মম শোষণ ও অত্যাচার চলে আসছিল, মার্কসবাদী আদর্শের প্রয়োগ ঘটিয়ে লেনিন সর্বপ্রথম সোভিয়েট রাশিয়ায় সেই শোষণ-অত্যাচারের অবসান ঘটান। অর্থনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি সর্বক্ষেত্রেই সোভিয়েট রাশিয়া অতি অল্প সময়েই উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে যায় এবং পুঁজিবাদী দুনিয়ার শিরোমণি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠত্বকে কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে দেয়। শুধু তাই নয়, সেদিন সোভিয়েট রাশিয়া গোটা দুনিয়ার মুক্তিকামী মানুষের আশা-ভরসার স্থল ও অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

এই সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে খতম করার জন্য পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ প্রথম থেকেই চেষ্টা চালিয়ে গেছে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর ১৯২১ সালেই লেনিনকে গুলিবিদ্ধ হতে হয়। পরবর্তী সময়ে পার্টির অন্যতম নেতা কমরেড কিরভের হত্যাকাণ্ডের পর কমরেড স্ট্যালিন উপলব্ধি করেন — পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের জাল অনেক গভীরে ছড়িয়ে পড়েছে। এর বিরুদ্ধে জনগণকে জড়িত করে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলির চক্রান্তকে তিনি প্রতিহত করেন। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট লালফৌজ জাপান ও জার্মানির ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পর্যুদস্ত করে গোটা বিশ্বের মানবজাতিকে সমূহ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে। যুদ্ধে বিধ্বস্ত সোভিয়েট রাশিয়ার অর্থনীতির পুনর্গঠনে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন স্ট্যালিন। পার্টির উনবিংশতিতম কংগ্রেসে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে আদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে শৈথিল্য, ব্যক্তিবাদী ঝোঁক, ভাববাদ ও পচাগলা পুঁজিবাদী সংস্কৃতির প্রভাব পার্টি ও সোভিয়েট সমাজকে কলুষিত করছে। এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েট সমাজকে মুক্ত করার জন্য তিনি এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এই সময়েই মৃত্যু এসে কমরেড স্ট্যালিনকে বিশ্ব সর্বহারা শ্রেণীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

পরবর্তী সময়ে যাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন, সেই ক্রুশ্চেভ, ব্রেজনেভ এবং গর্বাচভ মার্কসবাদের পথ থেকে ধীরে ধীরে সরে গিয়ে সংশোধনবাদের ব্যাপক চর্চার মধ্য দিয়ে সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে বিপর্যয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ চর্চার বদলে তাঁরা পুঁজিবাদী পথে উৎপাদন বাড়ানোর নীতি গ্রহণ করেন। ফলে মানুষের মধ্যে সুবিধাবাদ, অর্থনীতিবাদ, ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের মানসিকতা বাড়তে থাকে এবং এরই সুযোগ নিয়ে লুক্কায়িত পরাজিত পুঁজিবাদ আবার মাথাচাড়া দেয়। এই ঘটনার পরিণতিতেই সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের পতনের সূচনা হয় ও পুঁজিবাদের প্রত্যাবর্তন ঘটে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যুগোপযোগী ও উন্নততর উপলব্ধির ভিত্তিতে সঠিক প্রক্রিয়ায় শ্রেণীসংগ্রাম পরিচালনা করতে না পারার ফলেই সমাজতন্ত্রের এই বিপর্যয় ঘটে গেল। এ যুগের অগ্রগণ্য মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উন্নততর ও সমৃদ্ধ উপলব্ধির ভিত্তিতে আমাদের সামনে এই বিশ্লেষণই তুলে ধরেছেন। কমরেড বসু বলেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই উন্নততর উপলব্ধিকে নিরলস চর্চার মধ্য দিয়ে আয়ত্ত করতে হবে। অন্যথায় কমিউনিস্ট আন্দোলন বার বার দিশাভ্রষ্ট হবে।

সভাপতির ভাষণে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ দত্ত বলেন, দেশে দেশে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ও আমাদের দেশে সিপিএম-সিপিআই-এর বামপন্থা বিরোধী রাজনীতি মানুষের মধ্যে নানা বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে। কিন্তু আজ যাঁরা এদেশে সত্যিকারের বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছেন, প্রধান বক্তার আলোচিত পথেই বিশেষত ছাত্র-যুব সমাজকে এগিয়ে এসে সেই নতুন ধারার বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

মুখে সুন্দরবন বাঁচাও স্লোগান বাস্তবে ধ্বংসের কার্যক্রম

চারের পাতার পর

প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার মিলিতভাবে সুন্দরবনে সর্বনাশা পরমাণু বিদ্যুৎ চুল্লি নির্মাণের চেষ্টা করেছিল; সুন্দরবনের লড়াকু মানুষ তা রুখে দিয়েছেন। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সাহারার ইকোট্যুরিজম প্রকল্পের বিরুদ্ধেও জনমত গড়ে উঠছে, তৈরি হয়েছে ‘সুন্দরবন জনস্বার্থ ও পরিবেশ রক্ষা কমিটি’। এখন এলাকায় এলাকায় চলছে এর শাখা গঠনের উদ্যোগ। সুন্দরবনবাসী সংগ্রামী জনগণের এই উদ্যোগ অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু তাঁদের সংগ্রামকে আরও ক্ষুরধার করতে বুঝে নিতে হবে — কেন তাঁদের উপর এই আক্রমণ, কী তার মূল কারণ।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ আজ দুনিয়াজোড়া বাজার সঙ্কটে ধুঁকছে। শোষণে জর্জরিত অধিকাংশ মানুষেরই আজ আর ভোগ্যপণ্য কেনবার ক্ষমতা নেই। ফলে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে মালিকশ্রেণী পুঁজি বিনিয়োগ করতে চাইছে না। তারা পুঁজি ঢালতে চাইছে শেয়ার বাজারের ফাটকায়। তারা চাইছে কেন্দ্রের ও রাজ্যের সরকারগুলো ব্যাঙ্ক-বীমা-হাসপাতাল-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে তাদের মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিক। সরকারগুলিও ঐসব ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে নিয়ে মালিকী লুণ্ঠনের জন্য দরজা জানলা খুলে দিচ্ছে। ফলে ব্যাঙ্ক-বীমার বেসরকারীকরণ ঘটছে, সরকারি হাসপাতাল ধাপে ধাপে চলে যাচ্ছে বেসরকারি হাতে, শিক্ষাক্ষেত্রেও বেসরকারিকরণের থাবা। গরিব সাধারণ মানুষের সামনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে হাসপাতালে ফ্রি-চিকিৎসা ও স্কুল কলেজে ফ্রি শিক্ষার সুযোগ। রাস্তা-ব্রিজ-ফ্লাইওভার নির্মাণেও মালিকশ্রেণী পুঁজি ঢালছে, তবে তা সরকারের মাধ্যমে। কারণ, জনগণের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে সরকার সেই ঋণ সুদ সহ পরিশোধের গ্যারান্টি দিচ্ছে। এক্ষেত্রে মুনাফা কমা বা লোকসানের ভয় থাকে না, নির্দিষ্ট হারে মুনাফা পাইয়ে দেবার দায়িত্ব নেয় সরকার। সরকারি ভাষায় — এরই নাম ‘উন্নয়ন’। আর একটি ক্ষেত্রকে মালিকশ্রেণী পুঁজি ঢালার জন্য বেছে নিয়েছে, সেটি হল — অর্থবানদের ভোগ-লালসা-ফুর্তির ক্ষেত্র। সেজন্য পাঁচতারা-সাততারা হোটেল, বার, রেস্টুরেন্ট এবং অবশ্যই ট্যুরিজম শিল্পে তারা পুঁজি বিনিয়োগ করছে। সেজন্যই সুন্দরবনে ট্যুরিজম ব্যবসায় নামছে সাহারা ইন্ডিয়া। রাজ্যের সিপিএম সরকার তাদের মুনাফা লুটবার গ্যারান্টি দিচ্ছে। তাতে যদি সুন্দরবনের মানুষ ভিটেমাটি চ্যুত হয় হোক, সুন্দরবনের মা-বোনেদের সম্ভ্রম যদি লুণ্ঠিত হয় হোক, মৎস্যজীবীরা মরে তো মরুক, প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে তো হোক, অমূল্য অমূল্য ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস হয়ে প্লাবনে জলস্রোতে দ্বীপগুলি নদী ও সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেলে যাক। পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, যে কোন মূল্যে। তাতে, সরকারি মসনদে টিকে থাকার ক্ষেত্রে মালিকশ্রেণীর বরাভয় মিলবে, আর নেতা-মন্ত্রীদের জন্য মিলবে মালিকদের কিছু উচ্ছিষ্ট। মালিকশ্রেণীর সঙ্গে সিপিএম সরকারের এই লেনদেনেরই সম্পর্ক।

ফলে, সুন্দরবন তথা সুন্দরবনবাসীর উপর মালিকশ্রেণী ও সরকারের এই আক্রমণ কোন বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, দেশব্যাপী পুঁজিবাদী লুণ্ঠন ও আক্রমণেরই অংগ। তাই সুন্দরবনবাসীর সংগ্রামকেও দেশব্যাপী পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী সংগ্রামের অঙ্গ হিসেবেই গড়ে তুলতে হবে। তবেই তাঁদের প্রতিবাদ প্রতিরোধ সংগ্রাম প্রকৃত অর্থে গভীর তাৎপর্যবাহী হবে, আরও শানিত হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরমাণু বিদ্যুৎ চুল্লির বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামে এস ইউ সি আই যেমন নেতৃত্বকারী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সুন্দরবন রক্ষার নতুন লড়াইতেও তেমনি তারাই নেতৃত্বকারী ভূমিকায়। সাধারণ মানুষের আস্থা ও ভরসার জায়গা এখানেই। তাঁরা জানেন, টাকা ও মন্ত্রীত্বের টোপ দিয়ে মালিকশ্রেণী সব পার্টিকেই কিনে নিয়েছে, কিন্তু কিনতে পারেনি এই একটি পার্টিকে। হাজার ভয়ভীতি, সন্ত্রাস, মিথ্যা মামলা, খুন, মন্ত্রীত্বের টোপ সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে এই পার্টিটা জনগণের পাশে আছে, গরিব-মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার লড়াইতে নেতৃত্ব দিচ্ছে, রক্ত ঝরিয়ে প্রাণ দিয়েও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, দাবিও আদায় করছে। মানুষ বোঝে, এস ইউ সি আই তাদের সঙ্গে কখনো বেইমানি করবে না।

উত্তর দিনাজপুর

ফি-বৃদ্ধিবিরোধী আন্দোলনে নৃশংস আক্রমণ ১০ মে ছাত্র ধর্মঘট পালিত

বামফ্রন্ট সরকারের মদতে বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকার নির্ধারিত ৬৩ টাকা ফি’র চাইতে অনেক বেশি ফি ও ডোনেশন আদায় করছে। এরই সাথে সাথে বিভিন্ন কমপিউটার সংস্থার সঙ্গে যুগ্মভাবে স্কুলগুলিতে কমপিউটার কোর্স বাধ্যতামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। এর পেছনে যে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য রয়েছে তা পরিষ্কার। ছাত্রদের মধ্যে বিষয়গুলি নিয়ে অসন্তোষ দানা বাঁধছে।

৬ মে রায়গঞ্জের মহারাজা জগদীশনাথ হাইস্কুলে এ আই ডি এস ও এবং অভিভাবক ফোরামের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ডেপুটেশন দিতে গেলে কর্তৃপক্ষ স্মারকলিপি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। ইতিপূর্বেও প্রধান শিক্ষক এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাননি। ৬ মে ডেপুটেশন দেওয়ার সময় স্কুল পরিচালন কমিটির সম্পাদকের নেতৃত্বে একদল লোক ধারালো অস্ত্রশস্ত্র সহ এ আই ডি এস ও কর্মীদের উপর নৃশংস আক্রমণ চালায়। তাদের আক্রমণে এ আই ডি এস ও’র উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জামিরুল ইসলাম রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে। আহত হয় ৩ জন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই আক্রমণ থেকে সংগঠনের জেলা সভানেত্রী কমরেড মাধবীলতা পালও রেহাই পাননি। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা এগিয়ে এসে এই আক্রমণ থেকে অভিভাবক ও ডিএসও কর্মীদের রক্ষা করেন।

ডিএসও’র ডাকে ১০ মে রায়গঞ্জ ব্লকে স্বতঃস্ফূর্ত ও অভূতপূর্বভাবে ছাত্রধর্মঘট পালন করে। রায়গঞ্জ থানার বামুনগ্রাম হাসিমুদ্দিন হাইস্কুলে পঞ্চমশ্রেণীতে ভর্তির সময় ২৫৫ টাকা আদায়ের বিরুদ্ধে অভিভাবক ফোরাম গঠন করে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। আন্দোলনের চাপে স্কুল কর্তৃপক্ষ ৬৩ টাকায় ভর্তি নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। করণদিঘী থানার বেগুয়া হাইস্কুলে ৫ম শ্রেণীতে সকল ছাত্রছাত্রীর ভর্তির দাবিতে অভিভাবক কমিটির আন্দোলন চলছে। নকুল রাম, ওয়াইদুর রহমান প্রমুখ ছাত্ররা এবং অভিভাবক মুক্তার আহমেদ এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। সাবধান হাই স্কুলে ১৩ মে সরকার নির্ধারিত ৬৩ টাকা ফি-তে ভর্তি নেওয়ার দাবিতে কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করা হয়।

কমরেড মিলন মজুমদারের স্মরণসভা

এস ইউ সি আই-এর বিশিষ্ট সংগঠক, নদীয়া জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মিলন মজুমদার ফুসফুসের মারাত্মক সংক্রমণে গত ১৭ এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল গত ৭ মে বেথুয়াডহরীর দেশবন্ধু পাঠাগারের মাঠে। প্রায় দুই সহস্র মানুষের উপস্থিতিতে বিকাল সাড়ে চারটায় প্রয়াত কমরেড মিলন মজুমদারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান শুরু হয়। হিন্দু-মুসলিম, মহিলা-কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে বহু মানুষ মাল্যার্পণ করতে গিয়ে তাঁদের 'আপনজন'-এর প্রতিকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। কমরেড মিলন মজুমদারের প্রতিকৃতিতে অন্যান্যদের সাথে মাল্যদান করেন স্মরণসভার প্রধান বক্তা ও এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড ছায়া মুখার্জী, দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সলিল চক্রবর্তী ও কমরেড সুজিত ভট্টশালী, নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সেখ খোদাবক্স, বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড ভাস্কর রায়চৌধুরী, শিক্ষক সংগঠন এ বি টি এ'র নাকাশীপাড়া থানা কমিটির পক্ষে সুভাষ চক্রবর্তী, আর এস পির পক্ষে কমরেড শেখর দত্ত, মহব্বত সেখ ও শম্ভু সাহা, সিপিআই(এম-এল) লিবারেশনের পক্ষে কমরেড কাজল দত্তগুপ্ত, ডিএসপি'র কমরেড দেবব্রত চক্রবর্তী, সিপিআই (এম-এল)-এর কমরেড বাহার সেখ। এছাড়াও ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, কে কে এম এস, এ আই এম এস এস, এ আই ডি এস ও এবং এ আই ডি ওয়াই ও'র পক্ষ থেকেও মাল্যদান করা হয়।

স্মরণসভার প্রধান বক্তা কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, কমরেড মিলন মজুমদার বেলডাঙ্গা কলেজে এ আই ডি এস ও'র সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, ছাত্র সংসদের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছিলেন। নদীয়া জেলার যে ছাত্ররা বেলডাঙ্গা কলেজে পড়তে গিয়ে এ আই ডি এস ও'র সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, তাদের নিয়েই তিনি জেলায় এ আই ডি এস ও শুধু নয়, পার্টি সংগঠনেরও গোড়াপত্তন করেছিলেন।

কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, কমরেড মিলন মজুমদার ভাল তত্ত্ব আলোচনা করতে পারতেন না, ভাল বক্তৃতাও দিতেন না। তাঁর আচার-আচরণ ও জীবন দিয়েই তত্ত্বের কথাগুলি তিনি সাধারণ গরিব মানুষের কাছে নিয়ে গিয়েছেন। এই গুণাবলী জন্ম থেকেই পাওয়া যায় না, অর্জন করতে হয়। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে সংগঠন গড়তে গিয়ে সংগ্রামের পথে তিনি তা অর্জন করেছেন। তিনি মানুষকে ভালবেসেছেন। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নাম — এগুলোর কোনও মানেই তাঁর কাছে ছিল না। যেভাবে কাজ করলে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে, যেভাবে মিশলে গরিব মানুষগুলোকে বিপ্লবী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করা যাবে, সেইভাবেই তিনি বিপ্লবের বার্তা, কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

ডিগ্রি, চাকরি ছেড়ে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি পার্টি সংগঠনের জন্য নিয়োগ করেছিলেন। ১৯৮০ সালে ত্রিপুরায় ভয়ঙ্কর বন্যা হলে রিলিফ-এর কাজের জন্য দলের পক্ষ থেকে তাঁকে সেখানে পাঠানো হয়। সেখানেও একটি একটি করে লোক জোগাড় করে তিনি সংগঠন গড়ে তোলেন। দীর্ঘদিন সেখানে সংগঠন পরিচালনা করেন। আবার সংগঠনের প্রয়োজনে ত্রিপুরা রাজ্যের সংগঠনের দায়িত্ব ছেড়ে তাঁকে নদীয়ায় ফিরে এসে নাকাশীপাড়া থানার সংগঠনের কাজ করতে বলা হলে এক কথায় তিনি ফিরে আসেন। তাঁর প্রমোশন হল না ডিমোশন হল তা নিয়ে তিনি কিছুই ভাবেননি। শুধু পার্টি সংগঠন নয়, কমরেড মিলন মজুমদার নদীয়া জেলায় অসংগঠিত শ্রমিক, যারা খুবই অসহায়, তাদের নিয়েও বেশ কিছু সংগঠন গড়ে তুলেছেন।

কমরেড ছায়া মুখার্জী বলেন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। আপনারা সকলেই চান শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এদেশে বিপ্লব হোক। কমরেড মিলন মজুমদার তা চাইতেন। আপনারা তাঁর আরব্ধ কাজ সেই বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে যেমনভাবে যতটুকু পারেন সংগঠন গড়ে তোলার জন্য সংগ্রামে নিয়োজিত হোন। এই কাজটি করতে পারলেই কমরেড মিলন মজুমদারের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে।

রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু বলেন, একজন বিপ্লবীর বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভাবনাকে পরিশীলিত করার জন্য যুক্তিবুদ্ধির অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কিন্তু হৃদয়বৃত্তি না থাকলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। আদর্শকে চরিত্রে রূপ দিতে চাই হৃদয়বৃত্তি। কমরেড মিলন মজুমদারের এই হৃদয়বৃত্তি ছিল বলেই তিনি তাঁর জীবনযাত্রার স্পর্শে গরিব মানুষের মধ্যে এস ইউ সি আই-এর আদর্শ নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কমরেড মিলন মজুমদারের বিয়োগব্যথা থেকে আমাদের বুঝতে হবে কেন আমরা রক্তের সম্পর্কহীন একজন মানুষের মৃত্যুতে ব্যথা পেলাম এবং এই ব্যথা আমাদের কী করতে বলে।

এস ইউ সি আই নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড সেখ খোদাবক্স বলেন, জেলায় দল গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এবং কর্মীদের দলে যুক্ত রাখার ক্ষেত্রে কমরেড মিলন মজুমদার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। বয়সের পার্থক্য খুব বেশি না থাকলেও কমরেড মিলন মজুমদার ছিলেন অনেকটা অভিভাবকের মত। কয়েক বছর আগে শারীরিক অসুস্থতার জন্য কমরেড মিলন মজুমদারকে গ্রামে গ্রামে না ঘুরে জেলা অফিসের কাজ ও কর্মীদের দেখাশোনা করার জন্য কৃষ্ণনগরে থাকতে বলা হলে তিনি অফিসে আটকে না থেকে মাঝে মাঝে নাকাশিপাড়ার গ্রামে গ্রামে ঘোরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন।

দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড বসির আহমেদ বলেন, কমরেড মিলন মজুমদারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনেই এক গভীর স্নেহের স্পর্শ পেয়েছিলাম। নিম্নবিত্ত চাষী পরিবারের সন্তান আমি। একদিন চাষের জমিতে কাজ করছি, দেখি মিলনদা আমার সাথে দেখা করার জন্য সেই জমিতে উপস্থিত। বাড়ির খবর, পড়াশুনার খবর নিয়মিত নিতেন। বেলডাঙ্গা কলেজেও মিলনদা আমাদের সঙ্গে সব সময় থাকতেন। স্নেহ দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে আমাদের বেঁধে ফেলেছিলেন।

জেলা কমিটির সদস্য কমরেড মহিউদ্দিন মান্নান তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেন, মিলনদার মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ বেথুয়াডহরীতে নিয়ে আসার পর যখন আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েছিল হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে নিঃস্ব গরিব ঘরের শত শত মায়েরা, বৃদ্ধ এবং কম বয়সী কিশোর-কিশোরীরা — বেথুয়াডহরীর সাধারণ মানুষ অবাক বিস্ময়ে, বিহ্বল দৃষ্টিতে দেখেছেন সেই দৃশ্য। রক্তের সম্পর্কশূন্য অনাত্মীয় একটি মানুষের জন্য এমন করে কান্নায় ভেঙে পড়া তাদের কাছে যথার্থই অভিনব ও বিস্ময়কর। সেই সমস্ত নিঃস্ব গরিব মা-বোনেদের কাছে আমিও ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ যে তাদের চোখ ও অনুভূতি দিয়ে মিলনদাকে আরও ভাল করে বোঝার সুযোগ পেয়েছি। কমরেড মান্নান বলেন, নদীয়া জেলায় সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মিলনদা ছিলেন পথিকৃতের ভূমিকায়। অথচ তার জন্য তাঁর সামান্যতম আত্মপ্রসাদও ছিল না। তা নিয়ে ফলাও করে গল্প করতেও কোথাও শুনিনি।

স্মরণসভার সভাপতি দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও নদীয়া জেলার পূর্বতন সম্পাদক কমরেড সুজিত ভট্টশালী বলেন, কমরেড মিলন মজুমদার শুধু নাকাশীপাড়ার এস ইউ সি আই-এর নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন নাকাশীপাড়ার জনগণের নেতা। তিনি ত্রিপুরা যাওয়ার আগেই দেখেছি, নাকাশীপাড়া থানায় এমন কোন গ্রাম ছিল না যেখানে মিলন মজুমদার যাননি। তিনি এই জেলায় আমাদের সকলের থেকে বয়সে বড় ছিলেন। অথচ, নির্বিবাদে আমাদের নেতৃত্ব মেনে, আমাদের কথা শুনে তিনি সংগঠনের কাজ করেছেন। আজ তাঁর বড়ত্ব আরও বেশি করে উপলব্ধি করছি।

সি পি আই (এম-এল) লিবারেশন-এর পক্ষে কমরেড কাজল দত্তগুপ্ত, ডি এস পি'র কমরেড দেবব্রত চক্রবর্তী, এ বি টি এ-র সুভাষ চক্রবর্তী ও সি পি আই (এম-এল)-এর কমরেড বাহার সেখ প্রয়াত কমরেড মিলন মজুমদারের সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন ও সুমধুর ব্যবহারের উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে স্মরণসভার কাজ শেষ হয়।

কলকাতা পুরসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে

একের পাতার পর

সন্ত্রাসের যে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল তাও সকলেরই জানা আছে। অথচ মমতা ব্যানার্জী কোনদিন তার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেননি; সেদিনও নয়, পরেও নয়। এ থেকেই বোঝা যায় তিনি আসলে সন্ত্রাসবিরোধী নন, তাঁর সিপিএমের সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরোধিতা শুধুমাত্র ক্ষমতার রাজনীতির স্বার্থে।

সকলেই জানেন, মমতা ব্যানার্জীও জানেন, ৮৫ সালের পর পাঁচ বছর বিজেপি'র দু'জন কাউন্সিলর ভোটাভুটির সময় অনুপস্থিত থেকে বা ভোটদানে বিরত থেকে সিপিএমকে পুরবোর্ড দখলে রাখতে সাহায্য করেছে, যা গোপন বোঝাপড়া ছাড়া সম্ভব নয়। কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে জ্যোতি বসু এবং বাজপেয়ী ও আদবানীর যৌথ সভার কথাও সকলেই জানেন। এমনকী বিগত এনডিএ সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী আদবানীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সুসম্পর্কের কথাও সকলেরই জানা। মমতা ব্যানার্জী নিজে এবং বিজেপি নেতারা এ রাজ্যে জ্যোতি বসু ও চন্দন বসুর দুর্নীতির তদন্ত ও সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রতিশ্রুতি বার বার দিলেও তা রক্ষা করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি।

যে মহাজোটের ডাক এখন সুব্রতবাবুরা দিচ্ছেন এবং তৃণমূল তা খারিজ করেছে ২০০১ সালে পাঁশকুড়া উপনির্বাচনে সেই মহাজোটের ডাক সর্বপ্রথম মমতা ব্যানার্জী দেন। সর্বোপরি তৃণমূল থেকে বেরিয়ে আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কংগ্রেসের সমর্থনেই তৃণমূল জোট পুরসভার ক্ষমতায় থেকেছে, তিনবার অনাস্থা প্রস্তাবের মুখে পড়লেও কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে তারা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার বিপদ কাটিয়েছে — এও মমতা ব্যানার্জী জানেন। কংগ্রেস সিপিএমের বন্ধু অতএব তার সঙ্গে মহাজোটে যাওয়া যায় না — একথা যখন মমতা ব্যানার্জী বলছেন তখনই তৃণমূল মালদহ, বীরভূম সহ নানা জেলায় ও অন্যত্র বহু আসনে কংগ্রেসের সঙ্গে ঐক্য করে বসে আছেন। তাছাড়া বিগত বিধানসভা নির্বাচনে মমতা ব্যানার্জী বিজেপিকে ছেড়ে কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, তখনও এই রাজ্যে কংগ্রেস ও সিপিএম পরস্পর বিরোধিতা করলেও কেন্দ্রে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের সম্পর্ক ভাল ছিল এবং বহুদিন ধরেই তা আছে। অতএব দেখা যাচ্ছে, মমতা ব্যানার্জীর কংগ্রেস ও সিপিএম বিরোধিতা; সিপিএমের তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি বিরোধিতা বা কংগ্রেসের সিপিএম ও বিজেপি বিরোধিতা — কোন বিরোধিতারই কোন জনমুখী ও নীতিগত ভিত্তি নেই। তাই দেখা যায়, ক্ষমতার অধীশ্বর বদল হয় কিন্তু নীতির বদল হয় না। পুরসভার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। উন্নয়ন বলতে মুষ্টিমেয় ধনী কর্পোরেট কর্তা, বিদেশি বিনিয়োগকারীদের চোখে শহরকে দৃষ্টিনন্দন করার জন্য যে কাজগুলি করার মডেল আসছে বিশ্বায়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বা বিদেশি ঋণদাতাদের কাছ থেকে, সেই মডেলকেই রূপায়িত করছে কংগ্রেস, তৃণমূল, বিজেপি ও সিপিএম। বিরোধিতা শুধুমাত্র ক্ষমতায় থেকে সেই টাকায় উন্নয়নের নামে কে বাহাদুরি নেবে ও নির্লজ্জ দলবাজী ও দুর্নীতি করবে তা নিয়ে। এর সাথে জনস্বার্থের কোন সম্পর্ক নেই। এই যাদের রাজনীতি, এই যাদের আচরণ, তেমন কোন দল পুরবোর্ড দখল করলে জনমুখী পুর-প্রশাসন ও সুষ্ঠু পরিষেবা আশা করা দুরাশামাত্র।

পুর পরিষেবার বেহাল অবস্থা

বলা বাহুল্য অতীতে এ ধরনের কোন না কোন দলের হাতে পুরবোর্ড থাকায় পুরপরিষেবা এখন একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। সুব্রত মুখার্জী বলেছেন — তাঁর আমলে পুরসভায় যত কাজ হয়েছে অতীতে কখনো তা হয়নি। কী উন্নয়ন হচ্ছে তা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। বাছা বাছা রাজপথ অ্যাসফল্ট মোড়া হচ্ছে, রাস্তায় ভেপার আলো লাগছে, পার্ক হচ্ছে, ফোয়ার ছুটছে, বড় বড় হাউসিং, শপিং মল হচ্ছে। শুধু পুরসভা নয়, পুরসভা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার সকলে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিদেশিদের চোখে কলকাতাকে আধুনিক শহর প্রমাণ করতে। এসবই করা হচ্ছে মূলত: বিদেশি ঋণের টাকায়। বলা বাহুল্য, কলকাতার জনগণের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে এগুলি করা হচ্ছে না, কলকাতার বিশ লক্ষ বস্তিবাসী বা লক্ষ লক্ষ নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের প্রয়োজন মেটানোর দিকে লক্ষ্য রেখেও এসব করা হচ্ছে না। যদি সেদিকে নজর থাকত তবে তাদের দ্বারা পরিচালিত পুর কর্তৃপক্ষ আগে জানতে চেষ্টা করতেন কী ধরনের উন্নয়ন জনস্বার্থে করা দরকার।

তাঁরা নিজেরাও জানেন, উপযুক্ত পরিমাণে পরিশ্রুত পানীয় জলের অভাব, নিকাশীর অব্যবস্থা, ও অল্প বর্ষাতেই জল জমা, স্তূপীকৃত জঞ্জাল, মশা-মাছির প্রবল উৎপাত, কর্পোরেশন স্কুলগুলির বা যক্ষ্মা হাসপাতাল ও মাতৃসদনগুলির দুরবস্থা, প্রতি বছর পালা করে আন্ত্রিক জন্ডিস ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ও প্রাণহানি — এ শহরের দীর্ঘদিনের সমস্যা। এগুলোর সমাধান করা পুরসভার দায়িত্ব। এক্ষেত্রে পুরসভা কী করেছে?

পুরনো পলতা-টালা জলপ্রকল্প বাদে নতুন করে তৈরি হয়েছে গার্ডেনরিচ জলপ্রকল্প, যার আওতায় রয়েছে সংযোজিত এলাকা সহ কলকাতা পুরসভার বড় একটা অংশ। এই প্রকল্পের আওতায় আনার সঙ্গে সঙ্গে এলাকার টিউবওয়েলগুলি তুলে

আটের পাতায় দেখুন

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

হাওড়া

বালী পুরসভায় নির্বাচন বয়কটের ডাক

সিপিএমের সন্ত্রাস ও রিগিং-এর প্রতিবাদে বালী পুরসভার আসন্ন নির্বাচন বয়কটের ডাক দিল এস ইউ সি আই-এর হাওড়া জেলা কমিটি। হাওড়া জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড শঙ্কর রায় চৌধুরী, জেলা কমিটির সদস্য কমরেডস্ কালিপদ কর ও অশোক ঘোষ, বালী লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড এন রায় এবং বেলুড় লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড দিলীপ ঘোষ গত ১০ মে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেন। তাঁরা বলেন, বিগত নির্বাচনগুলিতে সমাজবিরোধীদের দিয়ে বুথ জ্যাম, জাল ভোট, পুলিশ-প্রশাসন-নির্বাচনী অফিসারদের তাঁবেদারে পরিণত করা এবং সর্বোপরি মারাত্মক সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে সিপিএম নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। অন্যদিকে পানীয় জল, রাস্তা, নর্দমা, জঞ্জাল ইত্যাদি বিষয়ে করদাতারা কোনও পরিষেবা পাচ্ছেন না। এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিবর্তে কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে তাদের কর্মীদের সিপিএমের সন্ত্রাসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তাই বীতশ্রদ্ধ নাগরিকদের প্রতিবাদকে ভাষা দিতেই এই নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছেন তাঁরা।

ফ্যাসিবাদের পরাজয় ও সমাজতন্ত্রের বিজয়ের ৬০তম বার্ষিকীতে মস্কোর জনগণ সর্বহারার মহান নেতা লেনিন ও স্ট্যালিনের ছবি হাতে মূল অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার অনুমতি না পাওয়ায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।

কলকাতা পুরসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে

সাতের পাতার পর

দেওয়া হয়েছে, বিদেশি টাকায় গভীর নলকূপ থেকে তোলা নলবাহিত আঞ্চলিক জলপ্রকল্পগুলি অকেজো করে দেওয়া হয়েছে। অথচ বহুতল বাড়িগুলিতে অবাধে তোলা হচ্ছে ভূগর্ভস্থ জল। ফলে শহরের জলের স্তর নেমে যাচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ বাড়ছে। পুরপ্রশাসনের সঙ্গে যোগসাজসে প্রমোটার চক্র এলাকার পুকুর ও জলাভূমি বেআইনিভাবে ভরিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ি তোলায় পুকুরের জলও অমিল। গার্ডেনরিচের জলের চাপ প্রায়শই কম থাকায় বহু ওয়ার্ডে জলকষ্ট প্রবল। বহু এলাকায় পাইপের জল নেই। আবার পুকুর টিউবওয়েল না থাকায় সেই কষ্ট সহ্যের মাত্রা ছাড়াচ্ছে। এইভাবে জনগণকে বিকল্পহীন একটি কেন্দ্রীয় জলসরবরাহের ওপর নির্ভরশীল করা হয়েছে আগামী দিনে একেবারে বস্তিবাসী পর্যন্ত সকলের ওপর জলকর বসানোর উদ্দেশ্যে। জলকরের প্রস্তাবও বার বার আসছে। জল কর বসানোর প্রশ্নে কিন্তু কংগ্রেস, তৃণমূল ও সিপিএমের মৌলিক কোন মতপার্থক্য নেই।

পুরসভার জল কতটা পান করার যোগ্য? এটাও একটা বড় প্রশ্ন। জল কেবল কাদা মেশানো নয়, অনেক ক্ষেত্রে জীর্ণ পাইপ ফেটে পানীয় জলের সঙ্গে মল-মূত্র মিশে যায়। এটা সকলেরই জানা বলে, যাদের সঙ্গতি আছে তাঁরা জল ফুটিয়ে খান বা বাড়িতে অ্যাকোয়াগার্ড বসান। কিন্তু যাদের সঙ্গতি নেই তারা এই জলপান করতে বাধ্য হন, ফলে কলকাতায় প্রতি বছরই আন্ত্রিক ও জন্ডিস সংক্রমণ ভয়াবহ রূপ নেয়।

কলকাতার শতাধিক বর্ষের পুরনো ব্রিটিশ আমলের নিকাশী ব্যবস্থাটাই আজও মূল ব্যবস্থা। জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও নগরায়নের সঙ্গে তাল রেখে এর আধুনিকীকরণের জরুরি কাজটি উপেক্ষিতই থেকেছে। শহরের মূল নিকাশী খালগুলির কোন সংস্কার নেই। খালপাড়ের গরিব মানুষের বসতি উচ্ছেদে পুরসভা ও রাজ্য সরকার যে তৎপরতায় বুলডোজার পে লোডার নিয়ে হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, খাল সংস্কারে তার শতাংশের একাংশ তৎপরতাও দেখা যায়নি। বসতি উচ্ছেদ করে গরিব মানুষকেই শুধু সাফ করা হয়েছে, বদ্ধ খালগুলি বদ্ধই থেকে গিয়েছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই কলকাতার এমনকী প্রাণকেন্দ্রগুলিতে জল জমে যায়, বহু ওয়ার্ডে পাড়ার রাস্তায় জল জমে থাকে দিনের পর দিন। তার সঙ্গে জঞ্জাল মিশে পচা জল থেকে দুর্গন্ধ ও রোগ ছড়ায়। কলকাতার ভূপ্রাকৃতিক ঢাল পূর্বদিকে অথচ এদিকে অবৈজ্ঞানিক নগরায়ণ করা হয়েছে নিকাশীর সামগ্রিক পরিকল্পনা ছাড়াই। যদৃচ্ছা প্রমোটারির ফলে জলাশয়গুলি বুজিয়ে ফেলায় বাড়তি জল যাওয়ার জায়গা পাচ্ছে না — এসব সমস্যা দূর করা এদের উন্নয়নের নকশায় নেই।

কলকাতা কর্পোরেশনের স্কুল, যক্ষ্মা হাসপাতাল ও মাতৃসদনগুলি বেশিরভাগই উঠে গিয়েছে, অথচ স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন এগুলি গরিব মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও যক্ষ্মার চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কর্পোরেশনের টিকাদান কেন্দ্র ও ম্যালেরিয়ার রক্তপরীক্ষা কেন্দ্রগুলিরও কার্যকারিতা শূন্যের কোঠায়।

জল, জঞ্জাল ও নিকাশীর অব্যবস্থায় শহরে রোগের প্রসার অবাধ। বড় বড় বহুতল বাড়ির রিজার্ভারগুলি প্রাণঘাতী ম্যালেরিয়ার বাহক অ্যানোফিলিস মশার আঁতুড় ঘর। ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া একবিংশ শতকেও কলকাতার আতঙ্ক। দেড় শতাধিক বছর আগে কবি ঈশ্বচন্দ্র গুপ্ত লিখেছিলেন — ''রেতে মশা দিনে মাছি এই নিয়ে কলকেতায় আছি।'' মশা এখন রাতে শুধু নয় দিনেও। আনন্দবাজার প্রতিদিন যে ওয়ার্ড সমীক্ষা চালাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে প্রায় প্রত্যেক ওয়ার্ডের অভিযোগ হল — মশার উপদ্রব অসহ্য। মাছিও কম নয়। পুরসভা ফতোয়া দিচ্ছে — মশারি খাটিয়ে ঘুমান। কিন্তু বস্তি এলাকায়, গরিবের ঘরে এতো জায়গা কোথায়? মশারি খাটানো সেখানে বিলাসিতা।

কলকাতা পুরসভার কিংবদন্তিসুলভ দুর্নীতির কেশস্পর্শ করেনি কোন পুরবোর্ড। ফলে দুর্নীতি একেবারে রন্ধ্রে রন্ধ্রে। প্ল্যান স্যাংশন থেকে লাইসেন্স বের করা, ঘুষ ছাড়া কোন কাজ কর্পোরেশনে হয় না। ঘুষ দিয়ে সবরকম বেআইনি কাজই চলে। কর্পোরেশনের দপ্তরে দপ্তরে বাস্তুঘুঘুর বাসা, এমনকী স্বয়ং মেয়রের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন তাঁরই দলের মেয়র পারিষদ (জঞ্জাল) মালা রায়। এই বেহাল পরিষেবা অ্যাডেড এরিয়ায় আরও প্রকট। অথচ পুরকর বাড়ছে লাফ দিয়ে।

উন্নয়নের ধোঁকা

তবু বলা হচ্ছে, শহরের উন্নয়ন হচ্ছে। রাজ্য সরকার বলছে আমরা উন্নয়ন করছি। কর্পোরেশন বলছে আমরা উন্নয়ন করছি। কিন্তু কার পরিকল্পনায় কার স্বার্থে কি উন্নয়ন? বলা বাহুল্য দেশিবিদেশি পুঁজিপতি ও কর্পোরেট কর্তাদের শহরবাস আরামদায়ক করতে, মূলত বিদেশি ঋণের টাকায় চলছে এই তথাকথিত উন্নয়ন। উন্নয়নের কৃতিত্ব নিয়ে চাপান-উতোরে গণশক্তিই (২১-৪-০৫) লিখেছে — ''১৭১১ কোটি টাকার 'কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্পে'ও আসলে কলকাতা কর্পোরেশনের তৃণমূলী বোর্ডের কোনো কৃতিত্ব নেই। এই প্রকল্পে এডিবি দেবে ১০১২ কোটি টাকা, ডিএফআইডি দেবে ১৯৩ কোটি টাকা। বাকি পাঁচশো কোটি টাকার অর্ধেক দেবে রাজ্য সরকার বাকিটা কর্পোরেশন। তারপর গণশক্তি লিখছে, ''তৎকালীন মেয়র প্রশান্ত চ্যাটার্জীর উদ্যোগেই এডিবি'র ঋণ এবং ডিএফআইডি'র অর্থসাহায্য মঞ্জুর হয়েছে। এখন সেই প্রকল্পকে দেখিয়েও কৃতিত্ব নেওয়ার চেষ্টা করছেন মেয়র সুব্রত মুখার্জী।''

তাহলে কলকাতার উন্নয়নের নামে প্রত্যেকেই যে নিজের নিজের কৃতিত্ব জাহির করছে, সেই উন্নয়নে যে বিশাল টাকা খরচ হচ্ছে তার বেশিটাই হচ্ছে বিদেশি ঋণ, যা নাগরিকদেরই কড়ায় গণ্ডায় সুদ সহ শোধ করতে হবে। অথচ, নাগরিকরা জানেন না তাদের ঘাড়ে যে ঋণের বোঝা চাপছে সেই টাকা উন্নয়নের নামে কতটা খরচ হচ্ছে, কতটা দুর্নীতিতে যাচ্ছে। এই হল উন্নয়নের নেপথ্য কাহিনী। আর এই উন্নয়ন হচ্ছে কার স্বার্থে, কার নির্দেশে ? দেখা যাচ্ছে, এই উন্নয়নের ধারাতেই ঠিকাদার প্রমোটার সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে কলকাতা। প্রমোটারদের অত্যাচারে শহরের বহু পুরানো বাসিন্দা বাড়ি বেচে বাইরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বহুমূল্য জমিতে ততোধিক বহুমূল্য ফ্ল্যাট উঠছে, সেখানে বাসা নিচ্ছে উঠতি বড়লোকের দল। কলকাতার জনবিন্যাসের চরিত্র বদলাচ্ছে, কলকাতার পুরনো পাড়াগুলি ঐতিহ্য হারাচ্ছে, কলকাতার সংস্কৃতি বদলে যাচ্ছে বিশ্বায়নের সুরে সুর মিলিয়ে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এই সর্বনাশের প্রধান পুরোহিত। কর্পোরেশন তাদেরই সহযোগী। এদের চোখে উন্নয়ন মানে জনজীবনের উন্নয়ন নয়। শহরের পাঁচ হাজার বস্তির বিশ লক্ষ মানুষের জীবনের উন্নয়ন নয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রসার নয়, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা নয়, রোগ দূরীকরণ নয়, দুর্নীতি ঘুষ বন্ধ করা নয়। এদের উন্নয়ন হল বড় বড় রাজপথ ভেপার ল্যাম্প আর পার্ক ও ফোয়ারা অর্থাৎ রোগগ্রস্ত চামড়ার ওপর দামী প্রসাধনের প্রলেপ দিয়ে কদর্যতাকে আড়াল করা।

এই যাদের কাজ তাদের উপর যদি নাগরিকরা নির্ভর করেন তবে তাঁদের আবারও ঠকতে হবে। ক্ষমতার দাবীদার এদের যে কেউই পুরবোর্ড গঠন করুক না কেন, তার দ্বারা প্রকৃত নাগরিক স্বার্থ কোনমতেই রক্ষিত হতে পারেনা। এরা প্রত্যেকেই কর্পোরেট হাউস, পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী দল। এই অবস্থায় জনগণ যদি একমাত্র আন্দোলনের চাপে পুরকর্তাদের বাধ্য করতে পারেন, তবেই তাঁরা প্রকৃত জনস্বার্থে সুষ্ঠু পুর পরিষেবা পেতে পারেন। ফলে আগামী পুর নির্বাচনে আন্দোলনের শক্তিকেই বেছে নিতে হবে ক্ষমতাসীনদের বিকল্প হিসাবে। যে সমস্ত কেন্দ্রে আন্দোলনের প্রকৃত শক্তি এস ইউ সি আই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, প্রকৃত নাগরিক স্বার্থে তাদের বেছে নেওয়াই আজ জনগণের প্রকৃত দায়িত্ব।

শিল্প সংস্থাগুলিকে রাজ্য সরকারের উপহার — বিদ্যুতে ভর্তুকি

ভর্তুকি সহ জনগণের জন্য দেওয়া সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধার উপর যখন কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার খড়্গহস্ত, তখন শিল্পমালিকদের জন্য বিদ্যুতে ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এ'রাজ্যের সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার।

বিজেপি পরিচালিত পূর্বতন এন ডি এ সরকারের মতোই কংগ্রেস পরিচালিত বর্তমান ইউ পি এ সরকার ভর্তুকির ঘোর বিরোধী। অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম গত ডিসেম্বরে সংসদে এক রিপোর্ট দাখিল করে ঘোষণা করেছেন খাদ্য, সার ও পেট্রোলিয়ামের উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নিতে হবে, দাম নির্ধারণের জন্য এগুলিকে বাজারের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। যদিও অর্থমন্ত্রী তাঁর রিপোর্টে বলেছেন যে কেবলমাত্র দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ভর্তুকি দেওয়া হবে, কিন্তু সার এবং বিশেষত খাদ্যদ্রব্যের উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নিয়ে এগুলির দাম নির্ধারণের ভার বাজারের হাতে ছেড়ে দিলে, সাধারণ মানুষ কীভাবে ভর্তুকির সুবিধা পাবেন, তা একমাত্র অর্থমন্ত্রীই জানেন!

এ রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকারেরও এ বিষয়ে বিশেষ বিরোধিতা নেই। তারাও স্বাস্থ্য সহ অন্যান্য জনপরিষেবাগুলির জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছে। সভা-সমাবেশে এই সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা বলছেন 'চিরকাল ভর্তুকি দেওয়া যায় না'। অথচ শিল্পপতিদের লাভের অঙ্ক বাড়াতে এবার তাঁরাই আবার রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এলাকাধীন শিল্পগুলিকে ব্যবহার্য বিদ্যুতের উপর ভর্তুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন !

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in